সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ৩৩-৩৪
০৮ জুন ২০২৬, সোমবার

ইরাকে ইসলামের প্রথম যুগের মাটির মসজিদ আবিষ্কার: ইতিহাসের এক বিরল সাক্ষ্য

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية
تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৪০০৯১১১০০০১২২১৪

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ
বার্ষিক : ৭০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
আন্তর্জাতিক
মহাসম্মেলন -২০২৬

০৫ ও ০৬ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-
Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

The weekly Arafat
সাপ্তাহিক
আরাফাত
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

৩৩-৩৪ সংখ্যা
০৮ জুন-২০২৬ ঈসায়ী
২৫ জ্যৈষ্ঠ-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২১ যিলহাজ্জ-১৪৪৭ হিজরি

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সূচিপত্র

- মণির খনি: ০২
- সম্পাদকীয়– ইসলামী দণ্ডবিধি: ন্যায়বিচার ও অপরাধ প্রতিরোধের এক চিরন্তন দর্শন ০৩
- দারসুল কুরআন– তাক্বওয়াই হোক মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য!
  আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৫
- দারসুল হাদীস: সূরা আল-ইখলাসকে ভালোবাসার প্রতিদান জান্নাত
  গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
- হজ্জের খুতবা-২০২৬: আখিরাতের প্রস্তুতিস্বরূপ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য
  শায়খ ড. আলী বিন আব্দুর রহমান আল-হুযাইফী (হাফিযাহুল্লাহ)
  অনুবাদক: ড. হারুনুর রশীদ ত্রিশালী- ১১
- প্রধান রচনা– দার্‌স-তাদরীস ও ইল্‌মী হালাকার পুনর্জাগরণ: বাস্তবতা, সংকট ও দাওয়াতী রূপরেখা
  আব্দুল হাকীম মাদানী- ১৬
- ইসলামী প্রবন্ধ: 'আশুরায়ে মুহার্‌রম, কারবালা ও মুসলিম বিভক্তির সূচনা
  সংকলনে– মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া- ১৮
- প্রবন্ধ: নবাব সলিমুল্লাহ ও নারী শিক্ষার বিকাশ
  আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৩
- প্রাসঙ্গিক ভাবনা: সালাফদের গোপন 'ইবাদত ও বর্তমানে আমাদের অবস্থা
  মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম- ২৫
- আলোকিত জীবন: বিপ্লবী বীর সেনানী সাইয়েদ আহমেদ ব্রেলভী (রহিমাহুল্লাহ)
  আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ২৮
- ক্বাসাসুল হাদীস: জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র উটের ঘটনা
  আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ৩০
- সাময়িক প্রসঙ্গ: অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর
  মো. খশিউর রহমান বিন মো. মুনসুর আলী- ৩১
- জমঈয়ত সংবাদ ৩৩
- স্বাস্থ্য সচেতনতা ৩৬
- ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৭
- প্রচ্ছদ পরিচিতি– ইরাকে ইসলামের প্রথম যুগের মাটির মসজিদ আবিষ্কার: ইতিহাসের এক বিরল সাক্ষ্য
  আবু ফাইয়ায জি. রহমান- ৪৮

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com,
www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat

منجم جواهر / মণির খনি

অনন্তর মহান আল্লাহর বাণী

০১ "কখনই কোনোকিছুর ব্যাপারে তুমি বলো না যে, ওটা আমি আগামীকাল করব; ইন্ শা-আল্লাহ (আল্লাহ ইচ্ছা করলে) এই কথা না বলে।" *(সূরা আল-কাহ্ফ : ২৩-২৪)*

০২ "আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা কুফ্রী করেছে, তারা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোনো কল্যাণ নাযিল হোক।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১০৫)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

০১ উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাবাশ মুলুকে তাঁর দেখা একটি উপাসনালয় এবং তাতে অবস্থিত মূর্তিসমূহের কথা উল্লেখ করলেন, তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, তাঁদের মধ্যে কোনো ভালো লোক বা সৎ বান্দা মারা গেলে তার কবরের ওপর তারা মসজিদ নির্মাণ করতঃ এবং ঐ মসজিদের ভিতরে ঐ সৎলোকের মূর্তি স্থাপন করত। সৃষ্ট জগতে ঐ সব লোক মহান আল্লাহর নিকট অতি নিকৃষ্ট। কারণ তারা দু'টি ফিতনার সমাবেশ ঘটিয়েছে একটি কবর পূজার ফিতনা আর একটি মূর্তি পূজার ফিতনা। *(সহীহুল বুখারী)*

০২ সাধু-সজ্জনদের কবরগুলোকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি করলে এতে গাইরুল্লাহর 'ইবাদত হয়। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

০৩ রাসূল (ﷺ) বলেছেন, দেখো! তোমরা আমার কবরকে মেলার স্থান বানিও না এবং তোমাদের গৃহগুলোকে কবরস্থান (নামাযের জন্য নিষিদ্ধ স্থান) বানিও না। অনন্তর তোমরা যেথায় থাকো না কেন তোমাদের দেয়া সালাম অবশ্যই আমার নিকট পৌঁছিয়ে থাকে। *(বাছাই করা হাদীস থেকে)*

এই ধারণা করা যে, মু'মিনদের তুলনায় কাফিররাই অধিক সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

০৪ বিভ্রান্তকারী নেতৃমণ্ডলী হতে ভয় করাই যে উম্মাতের ওপর কর্তব্য তৎপ্রতি গুরুত্বারোপ করা। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

০৫ গণৎকার মুশরিক এবং গণনা করা শির্ক। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

০৬ রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ইয়াফা, তুরাক, তীরাহ যাদুর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আওফ ব্যাখ্যা করে বলেন, ইয়াফা হচ্ছে পাখী তাড়া করা, আর তুরাক হচ্ছে সেই দাগ যা মাটিতে আঁকা হয়। তীরাহ হচ্ছে জীবন্ত– হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ওটা হচ্ছে শয়তানের মন্ত্র-তন্ত্র। *(সুনান আবূ দাঊদ; সুনান আন্ নাসায়ী; ইবনু হিব্বান)*

০৭ নুজুমী বিদ্যা, গিরা লাগিয়ে তাতে ফুঁ দেয়া, অপবাদ দেয়া এবং অলঙ্কারপূর্ণ কথা যাদুর অন্তর্ভুক্ত। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

০৮ রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নুজূমী বিদ্যা শিখল সে কিছু যাদু শিখল। যাদু যতবেশি শিখে ততই বেশি অগ্রবর্তী হয়। *(সুনান আবূ দাঊদ)*

০৯ রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে দাঁতে কাটা কাকে বলে সেই খবর দিব কি? ওটা হচ্ছে অতিরিক্ত কথা ছড়িয়ে লোকদের মধ্যে অপবাদ বিস্তার করা। *(সহীহ মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, অবশ্যই কোনো কোনো বক্তব্য যাদুই হয়ে থাকে। *(সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম)*

১০ গণৎকারকে সত্য বলে জানা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

১১ আত্মায়াফ বা কাহেনের (গণক) কথা বিশ্বাস করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

১২ আবজাদ প্রবর্তিত অক্ষরসমূহের মাধ্যমে গণনা বিদ্যা আয়ত্ব করা শির্কের শামিল। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

১৩ নোশরা বা প্রতিরোধক যাদু শির্ক তবে হ্যাঁ ওটা যদি কুরআন মাজীদের দু'আ দ্বারা সম্পাদিত হয় তবে সেটা বৈধ হবে। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

افتتاحية / সম্পাদকীয়

ইসলামী দণ্ডবিধি: ন্যায়বিচার ও অপরাধ প্রতিরোধের এক চিরন্তন দর্শন

বিশ্ব আজ এক বৈপরীত্যের যুগ অতিক্রম করছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সত্ত্বেও মানবসমাজ ক্রমবর্ধমান অপরাধ, সহিংসতা, ধর্ষণ, মাদক, দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং নৈতিক অবক্ষয়ের গভীর সংকটে নিমজ্জিত। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আইন প্রণয়ন হচ্ছে, কারাগারের সংখ্যা বাড়ছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; তবুও অপরাধের গ্রাফ নিম্নমুখী হওয়ার পরিবর্তে ঊর্ধ্বমুখীই হচ্ছে। এই বাস্তবতায় অপরাধ দমন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রশ্নে মানবজাতিকে আবারও মৌলিক কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে- শাস্তির উদ্দেশ্য কী? আইন কি কেবল অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর প্রতিক্রিয়া দেখাবে, নাকি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তাকে প্রতিরোধ করবে?

ইসলাম এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। ইসলামী শরিয়তের দণ্ডবিধি- যার মধ্যে হদ, কিসাস ও তাআযীর অন্তর্ভুক্ত। কেবল অপরাধীকে দণ্ডিত করা নয়; বরং পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করাই ইসলামী দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে শাস্তির মূল লক্ষ্য প্রতিশোধ নয়; বরং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানুষের জীবন-সম্পদ-সম্মান রক্ষা করা এবং সমাজকে অপরাধের ভয়াবহতা থেকে সুরক্ষিত রাখা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কিসাস সম্পর্কে বলেছেন, "তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে।" এই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণার মধ্যে ইসলামী দণ্ডনীতির সারমর্ম নিহিত। বাহ্যিকভাবে কঠোর মনে হলেও এসব শাস্তির উদ্দেশ্য মানুষের জীবন রক্ষা, অপরাধের পথ রুদ্ধ করা এবং সমাজে নিরাপত্তাবোধ প্রতিষ্ঠা করা। যখন একজন সম্ভাব্য অপরাধী জানে যে, তার অপরাধের নিশ্চিত ও দৃশ্যমান পরিণতি রয়েছে, তখন অপরাধে লিপ্ত হওয়ার আগে সে বহুবার চিন্তা করে। এ কারণেই ইসলামী আইনশাস্ত্রে শাস্তিকে কেবল প্রতিকারমূলক নয়; বরং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

বর্তমান বিশ্বে অনেকেই ইসলামী দণ্ডবিধিকে "মধ্যযুগীয়" আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো– ন্যায়বিচার, সামাজিক নিরাপত্তা, মানবজীবনের সুরক্ষা কিংবা অপরাধ প্রতিরোধের প্রয়োজন কি কোনো যুগে পুরোনো হয়ে যায়? চুরি, হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি কিংবা প্রতারণা যেমন অতীতে মানবসমাজের জন্য হুমকি ছিল, তেমনি আজও রয়েছে। সুতরাং এসব অপরাধ মোকাবিলার নীতিমালা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থার বয়স নয়; বরং তার কার্যকারিতা, ন্যায়সঙ্গততা এবং সামাজিক প্রভাবই হওয়া উচিত প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

ইসলামী দণ্ডবিধির সমালোচনায় প্রায়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষিত হয়। তা হলো, ইসলামে হদ শাস্তি কার্যকর করার জন্য অত্যন্ত কঠোর প্রমাণমানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও হদ শাস্তি কার্যকর না করার নীতি ইসলামী বিচারব্যবস্থার সুপ্রতিষ্ঠিত অংশ। ইতিহাসে বহু বিচারক ও ফকিহ সন্দেহের কারণে হদ শাস্তি স্থগিত করেছেন। অর্থাৎ- ইসলামের লক্ষ্য শাস্তি প্রয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়; বরং নিরপরাধের সুরক্ষা নিশ্চিত করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– ইসলামী দণ্ডবিধিকে তার সামগ্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। ইসলাম একদিকে চুরির শাস্তি নির্ধারণ করেছে, অন্যদিকে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিত করার ওপরও জোর দিয়েছে। ইসলাম একদিকে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে, অন্যদিকে পরিবারব্যবস্থা, নৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে শক্তিশালী করার নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ- ইসলাম অপরাধের শাস্তি নির্ধারণের পাশাপাশি অপরাধের কারণগুলো দূর করার গুরুত্বও দিয়েছে। আধুনিক অপরাধবিজ্ঞানও আজ স্বীকার করে যে কেবল শাস্তি দিয়ে অপরাধ নির্মূল করা যায় না; অপরাধের সামাজিক ও

অর্থনৈতিক উৎসগুলোকেও মোকাবিলা করতে হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী আইনব্যবস্থা শাস্তি ও প্রতিরোধ- উভয় দিকের সমন্বিত একটি কাঠামো উপস্থাপন করে।

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলেও প্রায়শই অপরাধীর অধিকারের প্রশ্নটি ভুক্তভোগীর অধিকারের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। অথচ একজন খুনের শিকার ব্যক্তির পরিবার, একজন ধর্ষণের শিকার নারী, অথবা ডাকাতির শিকার কোনো সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের দাবিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী বিচারদর্শন ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এ কারণেই ইসলাম অপরাধীকে দায়মুক্তির সুযোগ দেওয়ার পরিবর্তে ন্যায়বিচারের দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দিয়েছে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মুসলিম বিশ্বের বহু রাষ্ট্র আজ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচারভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে দূরে অবস্থান করছে। ফলে কোথাও কোথাও ইসলামী আইন নিয়ে ভুল ধারণা, অপপ্রচার এবং রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোনো নীতির অপপ্রয়োগ বা অসম্পূর্ণ প্রয়োগ সেই নীতির মৌলিক দর্শনের ব্যর্থতার প্রমাণ নয়; বরং প্রয়োজন হলো ইসলামী আইনশাস্ত্রকে তার মৌলিক উৎস, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং সমকালীন বাস্তবতার আলোকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা।

আজ যখন বিশ্বজুড়ে অপরাধ, নৈতিক সংকট এবং সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে, তখন ইসলামী দণ্ডবিধিকে কেবল আবেগ, প্রচারণা বা পূর্বধারণার ভিত্তিতে বিচার না করে জ্ঞান, গবেষণা এবং বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সভ্যতার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে কোনো সমাজ তখনই নিরাপদ ও স্থিতিশীল হয়, যখন সেখানে ন্যায়বিচারের প্রতি জনগণের আস্থা থাকে, অপরাধের নিশ্চিত প্রতিকার থাকে এবং আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হয়।

ইসলামী দণ্ডবিধির মূল বার্তা কঠোরতা নয়, ন্যায়বিচার; প্রতিশোধ নয়, সামাজিক নিরাপত্তা; নিপীড়ন নয়, অপরাধ প্রতিরোধ। মানবজীবন, সম্পদ, সম্মান, পরিবার ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার এই দর্শনই ইসলামী আইনব্যবস্থার প্রাণ। আধুনিক বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতার প্রেক্ষাপটে এই দর্শন নতুন করে চিন্তা, গবেষণা ও আলোচনার দাবি রাখে। কারণ নিরাপদ সমাজ, কার্যকর বিচার এবং অপরাধমুক্ত মানবিক সভ্যতা- এ তিনটি লক্ষ্য আজও মানবজাতির সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা।

আল্লামা মোহাম্মদ ‘আবদুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন

দা‘ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা‘ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে। *[আহলে হাদীস পরিচিতি]*

درس القرآن / দারসুল কুরআনঃ

তাক্বওয়াই হোক মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য!

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী (পরহেযগার/ধর্মভীরু) হতে পার।"[১]

অবতরণের প্রেক্ষাপট

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন, তখন মদীনার সমাজ ব্যবস্থা মক্কার মতো ছিল না। মক্কায় মূলত মূর্তিপূজারী মুশরিকরা ছিল। কিন্তু মদীনায় ৩টি ভিন্ন গোষ্ঠী একসাথে বসবাস করত: ➤ ইসলাম গ্রহণকারী আনসার ও মুহাজির (মু'মিন)। ➤ মদীনার ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় (আহলে কিতাব)। ➤ 'আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের অনুসারী মূর্তিপূজারী ও মুনাফিক দল।

এই মিশ্র সমাজের সবাইকে এক মহান আল্লাহর তাওহীদের পতাকাতলে একত্রিত করার এবং মূর্তিপূজা ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে আনার জন্য এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আল-কুরআনের ধারাবাহিকতায় 'ইয়া আইয়ুহান নাস' (হে মানবজাতি!) শব্দ দিয়ে এটিই প্রথম আয়াত, যেখানে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সব মানুষকে একসাথে ডেকেছেন। এর অর্থ, এই দাওয়াত কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী বা কালের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি কিয়ামত পর্যন্ত আসা প্রতিটি মানুষের জন্য মহান আল্লাহর প্রথম ও প্রধান নির্দেশ। এখানে বলা হয়েছে- তারা যে গোত্র বা ধর্মেরই হোক না কেন, তাদের মূল সৃষ্টিকর্তা এবং তাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তাই বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো দাসত্ব বা ইবাদত শুধু তাঁরই প্রাপ্য, কোনো সৃষ্টির নয়।

বিষয়বস্তু

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের দু'টি অতীত সত্য মনে করিয়ে দিয়েছেন– আমাদের সৃষ্টি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি। আর এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমাদের কেবল তাঁরই ইবাদত করে 'তাক্বওয়া' অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর (বিশ্লেষণ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ﴾

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো।"

ব্যাখ্যা: পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে صيغه غيب (গায়েবের সীগা/নামপুরষ)-এর মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে ধরণ পাল্টিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা خطاب (সম্বোধনের) মাধ্যমে আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন- "হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো" –এরকম ধরণ পাল্টানোর বহুবিদ উপকারিতা রয়েছে, যেমন- শ্রোতাকে সতর্ক কারা, নতুন কিছু শোনতে আগ্রহী করে তোলা, যে বিষয়টি বর্ণনা করা হবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমনটি বুঝাতেও التفات من الغيبة الى الخطاب (গায়েব থেকে সম্বোধনে প্রত্যাবর্তন) করা হয়।

আলকামা ও হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে আয়াতে يَاأَيُّهَا النَّاسُ এসেছে এটা মক্কী আর যে আয়াতে يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا এসেছে এটা মাদানী। এ রেওয়ায়েতটি مرفوع হওয়ার বিশুদ্ধতা মেনে নিলেও এটা ইবাদতের হুকুমকে কাফিরদের সাথে বিশেষিত করে না। কেননা, এখানে ماموربه (আদিষ্ট বিষয়) ইবাদত আরম্ভ করা, বৃদ্ধি করা এবং এর ওপর অটল থাকা এই তিনটি বিষয়ে মুশতারাক।

সুতরাং এখানে এ আয়াত অবতীর্ণের সময় যারা ছিলেন তাদেরকে শব্দগতভাবে শামিল করে নিবে এবং যারা পরবর্তীতে (কিয়ামত পর্যন্ত) আসতে থাকবে তাদেরকে এই النَّاسُ শব্দটি অর্থগতভাবে শামিল রাখবে। কেননা, রাসূল (ﷺ)-এর শরিয়ত থেকে মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত যে, শরীয়তের সম্বোধন ও বিধানাবলীর দাবি উভয়দলকে

---

* *সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল কুরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ। এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ:* ২১

শামিলকারী এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণিত। তবে দলিল যেগুলোকে নির্দিষ্ট করে দেয় (যেমন- নাবালেগ ও পাগল) এরা মুকাল্লাফ তথা শরীয়তের আওতাভুক্ত নয়। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নির্দেশ-

﴿اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ﴾

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো।"

ইবাদত শব্দের অর্থ হলো– আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট বিনয় প্রকাশ করা এবং দীনতা-হীনতা প্রকাশপূর্বক তার সম্মুখে অক্ষমতা প্রকাশ করা। ইবাদতের ভিত্তি তিনটি রুকনের ওপর স্থাপিত।

এক. আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার জন্য পরিপূর্ণ ভালোবাসা পোষণ করা: যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ﴾

অর্থ- "আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসে।"[২]

দুই. পরিপূর্ণ আশা পোষণ করা: যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ﴾

অর্থ- "এবং তারা তার দয়া প্রত্যাশা করে।"[৩]

তিন. মহান আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে ভয় করা: যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ﴾

অর্থ- "এবং তারা তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।"[৪]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

﴿اَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ﴾

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো।"

এর অর্থ হচ্ছে- وحدوا ربكم "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের একাত্ব বর্ণনা করো" অথবা وحدوه অর্থাৎ- "শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করো, আর কারো ইবাদত করো না।" এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মানবজাতীকে শুধুমাত্র এককভাবে তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু তিনি আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরও সৃষ্টিকর্তা।

তাওহীদ ও তাওহীদে উলুহিয়্যাহ: তাওহীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– কোনো কিছুকে এক করা বা এক হিসেবে মানা, ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, মহান আল্লাহকে তাঁর রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্ত্বে), উলুহিয়্যাহ্ (ইবাদতে) এবং আসমায়ে ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণাবলীতে) এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করার নামই হলো তাওহীদ। অর্থাৎ- মহাবিশ্বের স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা এবং একমাত্র উপাস্য হিসেবে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে অংশীদার না করা। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাওহীদে উলুহিয়্যাহ্ বা একমাত্র তাঁর ইবাদত করার নির্দেশই দিয়েছেন। যাবতীয় ইবাদতকে একমাত্র তাঁর জন্যই খালেসভাবে করতে হবে। ইবাদতে কাউকে শরিক (অংশীদার) করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থ- "আল্লাহর জন্য অংশীদার স্থাপন করো না, আর তোমরা তো জানো ও বুঝো।"[৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

"যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন।"

ব্যাখ্যা: এখানে اَلَّذِيْ خَلَقَكُمْ এটা رَبَّكُمُ-এর সিফাত; এটা আনা হয়েছে রবের মর্যাদা প্রকাশের এবং কারণ বর্ণনা করা জন্য।

خلق (সৃষ্টি করা) এর অর্থ হলো– কোনো জিনিসকে তার পরিমাণ মতো ঠিকঠাকভাবে সৃষ্টি করা। আর وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ-এর উদ্দেশ্য মক্কার কাফিরদের কেবল বাপ-দাদারা অথবা শুধু মানবজাতীই নয়; বরং যে সকল বস্তু সত্তাগত ও কালগত তাদের থেকে অগ্রে; চাই মানুষ, জন্তু, গাছ-পালা, পাহাড়, পর্বত এমনকি লওহ-কলম, আরশ-কুরসি যাই হোক সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এখন প্রশ্ন হলো– জ্ঞানসম্পন্ন ও জ্ঞানহীন এবং জীব ও জড়পদার্থ সবই যদি বুঝিয়ে থাকে তাহলে এখানে اَلَّذِيْنَ ব্যবহার করা হলো কেন? এটা তো শুধু জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী (ذوى العقول)'র ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। এর উত্তর হলো– এখানে غير ذوى العقول-কে ذوى العقول-এর ওপর প্রাধান্য দিয়ে ذوى العقول-এর জন্য নির্ধারিত শব্দ اَلَّذِيْنَ ব্যবহার করা হয়েছে।

আয়াতের এ অংশে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর ইবাদত করার জন্য তাওহীদের যুক্তিকতা তুলে ধরেছেন।

[২] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৬৫।*
[৩] *সূরা আল-ইস্‌রা: ৫৭।*
[৪] *সূরা আল-ইস্‌রা: ৫৭।*
[৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ২২।*

ইবাদতে তাওহীদ থাকতেই হবে, কেননা, তিনিই স্বীয় বান্দাকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বের দিকে এনেছেন, তিনিই তাদেরকে সৃজন করেছেন, সৃজন করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও, তিনিই প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত দান করেছেন, তিনিই যমীনকে বিছানাস্বরূপ বানিয়েছেন এবং আকাশকে করেছেন ছাদস্বরূপ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বাণী,

﴿اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

অর্থ- "তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক। এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ!"[৬]

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَّ هُمْ عَنْ اٰیٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ﴾

অর্থ- "এবং আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"[৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

"যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পারো।"

ব্যাখ্যা: ইমাম আবূ জা'ফার তাবারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো– যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার মাধ্যমে এবং তিনি তোমাদেরকে যা করার আদেশ করেছেন ও যা হতে নিষেধ করেছেন সেক্ষেত্রে তোমরা তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে এককভাবে নির্দিষ্টকরতঃ তাঁকে ভয় করো। যেন তোমরা তাঁর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ হতে আত্মরক্ষা করতে পারো এবং মুত্তাক্বীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো, যাদের প্রতি আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট।

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾ "যাতে তোমরা ভয় করো" –এর ব্যাখ্যায় মুজাহীদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, **لعلكم تطيعون** 'যাতে তোমরা অনুগত হও।' ইমাম আবূ জা'ফার তাবারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার মতে মুজাহীদ (রহিমাহুল্লাহ)'র এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো হয়তোবা তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তাঁর প্রতি আনুগত্যের প্রদর্শন ও গোমরাহী থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যমে ভয় করবে। উল্লেখ্য যে, এখানে **لعل** শব্দটি সন্দেহ প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং নিশ্চয়তা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিক্ষাসমূহ

১. জীবনের আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন করা: আমাদের চাকরি, ব্যবসা বা পড়াশোনা জীবনের সাময়িক প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু মানুষের সৃষ্টির মূল এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব করা। কোনো অবস্থাতেই এই মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না।

২. পূর্বপুরুষদের ভুল অন্ধভাবে অনুকরণ না করা: আয়াতে পূর্ববর্তীদের সৃষ্টির কথা বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি সত্যের বাইরে কোনো ভুল পথে থেকে থাকেন, তবে অন্ধভাবে তাদের অনুকরণ করা যাবে না। কেবল মহান আল্লাহর নির্দেশিত সঠিক পথই আঁকড়ে ধরতে হবে।

৩. কৃতজ্ঞতার মানসিকতা তৈরি করা: আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের অস্তিত্ব দিয়েছেন। এই সুস্থ জীবন ও সুন্দর পৃথিবীর জন্য আমাদের প্রতি মুহূর্তে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ (শুকরগুজার) থাকা উচিত। আর ইবাদত হলো– মহান আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম।

৪. শিরকমুক্ত জীবন গঠন করা: যেহেতু সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ, তাই জীবনের যেকোনো প্রয়োজনে সাহায্য কেবল তাঁর কাছেই চাইতে হবে। কোনো মানুষ, মাজার, মূর্তি বা অন্য কোনো সৃষ্টির সামনে মাথা নত করা যাবে না। আমাদের বিশ্বাস ও আমলকে সম্পূর্ণ শিরকমুক্ত রাখতে হবে।

৫. জীবনের সব ক্ষেত্রে 'তাকওয়া' বা আল্লাহভীতি বজায় রাখা: তাকওয়া কেবল সালাত-সিয়ামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি এবং পারিবারিক জীবনেও কেউ না দেখলেও "আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন" –এই ভয় মনে রাখা এবং সব ধরণের অন্যায় বা গুনাহের কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখাই হলো প্রকৃত তাকওয়া।

পরিশেষে বলতে চাই– আসুন! আমরা সবাই আমাদের জীবনের এই চূড়ান্ত লক্ষ্য– 'তাকওয়া' অর্জনের জন্য নিয়ত করি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ছোট-বড় কাজে যেন মহান আল্লাহর ভয় এবং তাঁর সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষা থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এই আয়াতের ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন –আমীন।

[৬] *সূরা আল-মু'মিন: ৬৪।*
[৭] *সূরা আল-আম্বিয়া-: ৩২।*

درس الحديث / দারসুল হাদীস:

সূরা আল-ইখলাসকে ভালোবাসার প্রতিদান জান্নাত

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه) أَنَّ رَجُلًا (ﷺ) قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَقَالَ إِنَّ حُبَّكَ إِيَّهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ.

সরল বঙ্গানুবাদ

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। জৈনক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-কে বলল, হে আল্লাহ রাসূল! আমি সূরা আল-ইখলাসকে ভালোবাসি। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন : তোমার এ ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।[৮]

হাদীসের ব্যাখ্যা

সূরা আল-ইখলাস কুরআনের ১১২তম সূরা, আয়াত সংখ্যা ৪টি, রুকূ' ১টি। ইখলাস অর্থ গভীর অনুরক্তি, একনিষ্ঠতা, নিরেট বিশ্বাস, খাঁটি আনুগত্য, ভক্তিপূর্ণ ইবাদত। শিরক থেকে মুক্ত হয়ে তাওহীদ বা এক আল্লাহর ওপর খাঁটি ও নিরেট বিশ্বাসী হওয়াকে ইখলাস বলা হয়। এ সূরার মর্মার্থের ভিত্তিতে নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল-ইখলাস। আল-ইখলাস কুরআনের সর্বকনিষ্ঠ সূরাগুলোর অন্যতম। যা আমাদের মধ্যে 'কুলহু আল্লাহ' নামে প্রসিদ্ধ। এই সূরায় মহান আল্লাহর পরিচয় ও গুণাবলিতে পরিপূর্ণ। সূরা আল-ইখলাস অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ সূরা। হাদীসে সূরা আল-ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে।

মু'মিনের জীবনের সবচেয়ে বড় আরাধনা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বত ও ভালোবাসার নিয়ামত। যারা সূরা আল-ইখলাস বেশি বেশি পাঠ করে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টি দেন এবং তারা আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হয়ে যান; আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মহব্বত করেন। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে! এর থেকে বড় অর্জন আর কী থাকতে পারে!

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন- নবী কারীম (ﷺ) জনৈক সাহাবীকে এক বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের ইমামতি করতেন। যখনই কেরাত পড়া শেষ করতেন, সূরা قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ পড়তেন। ফিরে আসার পর তারা নবী (ﷺ)-এর নিকট বিষয়টি আলোচনা করলেন। তিনি বললেন- سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ তাকে জিজ্ঞেস করো, কেন সে এমন করে? সাহাবায়ে কেরাম তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিয়েছেন- لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ، وَأَنَا أُحِبّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. এই পূর্ণ সূরাটাই রহমানের সিফাত ও গুণাবলির বিবরণ। তাই তা পড়তে আমি ভালোবাসি। নবী কারীম (ﷺ) তার জবাব শুনে সাহাবীদের বললেন- أَخْبِرُوْهُ أَنّ الله يُحِبّهُ. তাকে জানিয়ে দাও, মহান আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন।[৯]

সূরা আল-ইখলাসের সাথে মহব্বত ও আমলের সম্পর্ক এমনই ফযীলতের বিষয় যে, তা বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) فَقَالَ: إِنِّيْ أُحِبّ هَذِهِ السّوْرَةَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): حُبّكَ إِيّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنّةَ.

জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে আরয করল, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ সূরাটিকে আমি ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এই সূরার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[১০]

সূরা আল-ইখলাস পাঠকারীর জন্য জান্নাত অবধারিত: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি তিলাওয়াত করছিল-

﴿قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ○ اَللهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ ○ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ﴾

---

* *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[৮] *মুসনাদে আহমাদ- ১২৪৩২; সুনানে তিরমিযী- ২৯০১।*

[৯] *সহীহুল বুখারী- ৭৩৭৫; সহীহ মুসলিম- ৮১৩।*

[১০] *আহমাদ- ১২৪৩২; দারেমী- ৩৪৭৮; আবূ ইয়ালা- ৩৩৩৬; ইবনু হিব্বান- ৭৯২; আল-আহাদীসুল মুখতারাহ- ৫/১২৯।*

রাসূলে কারীম (ﷺ) তার তিলাওয়াত শুনে বললেন- وَجَبَتْ ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম- مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ কী ওয়াজিব হয়েছে, আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন- اَلْجَنَّةُ। জান্নাত।[১১] আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– আমি নবী কারীম (ﷺ) এর কাছে বসা ছিলাম। এক লোক এসে বলল, আমার এক ভাই এই সূরা (সূরা আল-ইখলাস) পড়তে ভালোবাসে। নবী কারীম (ﷺ) বললেন, তোমার ভাইকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।[১২]

সূরা আল-ইখলাস পাঠকারীর জন্য জান্নাতে অট্টালিকা নির্মিত হবে: ইট-পাথরের একটা ঘর নির্মাণের জন্য কত কষ্ট করতে হয়! কী পরিমাণ শ্রম ও চিন্তা করতে হয়! অথচ আমরা আরো কত সহজে আখিরাতে বিশাল বিশাল মহল ও প্রাসাদ তৈরি করতে পারি। যে মহলের একটা ইট রূপার, আরেকটা ইট স্বর্ণের। যার আস্তর অতি সুগন্ধময় মেশকের এবং যমিন সুরভিত হলুদ যাফরানের। আর কারুকার্য, সাজ-সরঞ্জাম এবং ভোগ-উপভোগের বিলাসপূর্ণ নিয়ামতরাজি কেমন, কী মানের ও কী পরিমাণে হবে তা তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আসুন! কীভাবে জান্নাতে অধিক হারে সেই বালাখানা তৈরি করা যায় এর আমল জেনে নিই। মু'আয ইবনু আনাস জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে কারীম (ﷺ) বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حَتّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرّاتٍ، بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنّةِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ: إِذًا نَسْتَكْثِرِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): اللهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ.

যে ব্যক্তি সূরা قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ দশবার পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। এ কথা শুনে 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তাহলে তো আমরা অনেক প্রাসাদের অধিকারী হয়ে যাব। (অর্থাৎ- অধিক হারে এই সূরা পাঠ করব। ফলে আল্লাহ আমাদের অনেক প্রাসাদ দান করবেন।) রাসূলে কারীম (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তা'আলার দান আরো প্রশস্ত, আরো উৎকৃষ্ঠ।[১৩] সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌعَشْرَ مَرَّاتٍ، بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا عِشْرِينَ مَرَّةً، بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً، بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلَاثَةُ قُصُوْرٍ فِي الْجَنّةِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ: وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَنْ لَنُكْثِرَنّ قُصُوْرَنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): اَللهُ أَوْسَعُ مِنْ ذٰلِكَ.

যে ব্যক্তি সূরা قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ দশবার পড়বে তার জন্য জান্নাতে অট্টালিকা নির্মাণ করা হবে। যে বিশবার পড়বে তার জন্য দু'টি অট্টালিকা তৈরি করা হবে। আর যে ত্রিশবার পড়বে তার জন্য তিনটি অট্টালিকা প্রস্তুত করা হবে। নবীজীর এই কথা শুনে 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তাহলে তো আমরা অনেক অট্টালিকার মালিক হয়ে যাব। রাসূলে কারীম (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তা'আলার দান এর চেয়ে আরো প্রশস্ত।[১৪]

সূরা আল-ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য: হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : জেনে রাখো, সূরা আল-ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।[১৫]

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে "কুলহু আল্লাহু আহাদ" পড়তে শুনলেন। সে বার বার তা মুখে উচ্চারণ করছিল। পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে বললেন। যেন ঐ ব্যক্তি তাকে কম মনে করলেন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন। এ সূরাহ হচ্ছে সমগ্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।[১৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রতিদিন রাতে শোয়ার পূর্বে সূরা আল-ইখলাস তেলাওয়াত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন: মহানবী (ﷺ) একদা সাহাবিদের বলেন,

---

[১১] *মুয়াত্তা মালেক- ২৫৭; মুসনাদে- ৮০১১; সুনানে তিরমিযী- ২৮৯৭; সুনানে নাসায়ী- ৯৯৪; মুস্তাদরাকে হাকেম- ২০৭৯।*

[১২] *আল-কামেল- ইবনু আদী, ২/৩৯০; মুসনাদে বাযযার- ৬৭৩১; ফাযায়েলে কুরআন- মুস্তাগফিরী, ১০৫০।*

[১৩] *মুসনাদে আহমাদ- ১৫৬১০।*

[১৪] *দারেমী- ৩৪৭২; ফাযায়েলে কুরআন- মুস্তাগফিরী, ১০৫৯; ইবনু কাসীর তার তাফসীরে হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন।*

[১৫] *সহীহুল বুখারী- ৪৬২৭; জামে' আত্ তিরমিযী- ২৮৯৯।*

[১৬] *সহীহুল বুখারী- ৫০১৩; সুনানে আবূ দাউদ- ১৪৬১; সুনানে নাসায়ী- ২/১৭১; মুয়াত্তা মালেক- ১/২০৮।*

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِيْ لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا أَيُّنَا يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

তোমরা কি এক রাতে কুরআন মাজিদের এক-তৃতীয়াংশ পড়তে পারবে? সাহাবিরা এ প্রস্তাবকে খুবই কঠিন মনে করলেন। ফলে তারা বলল, আমাদের মধ্যে এ কাজ কে করতে পারবে? মহানবী (ﷺ) তখন বললেন, সূরা আল-ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।[১৭]

সূরা আল-ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলার কারণ: কুরআন মাজিদ তিন ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ আহকাম বা বিধি-বিধানসংক্রান্ত। আরেক ভাগ জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের দুঃসংবাদসংক্রান্ত এবং অন্য ভাগ মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলিসংক্রান্ত। শেষোক্ত ভাগটি সূরা আল-ইখলাসে একত্রিত হওয়ার কারণে একে কুরআন মাজিদের এক-তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, মহানবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। আর এ সূরাটি (সূরা আল-ইখলাস)-কে একটি ভাগে পরিণত করেছেন।[১৮]

শয়তানের কু-প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল-ইখলাস পাঠ করে ডান দিকে তিনবার থুথু ফেলা: হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ يُوْشِكُ النَّاسُ اَنْ يَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ حَتّٰى يَقُوْلَ قَائِلُهُمْ هٰذَا اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ فَاِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا اَللهُ اَحَدٌ اَللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ.

আবূ সালমাহ্ বিন 'আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: এমন একটি সময় আসবে যে লোকেরা একে অপরকে অনেক প্রশ্ন করবে। এমনকি একজন বলে উঠবে যে, আচ্ছা সৃষ্টি জীবকে তো আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন তাহলে মহান আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন মানুষ এরকম কথা বলবে তখন বলো: আল্লাহ একক, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারোর সন্তান নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। এরপর তিনবার বাম দিকে থুথু ফেলে শয়তান থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।"[১৯]

সূরা আল-ইখলাস তিলাওয়াতকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়: আবুল হাসান মুহাজির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে এক সফরে ছিলেন। (একদিন তাঁর কাছে এমনভাবে বসা ছিলেন যে,) তার হাঁটু দু'টি নবীজীর হাঁটুদ্বয়ের সঙ্গে লেগে ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে,

فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ قَالَ: بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ، وَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ، قَالَ: غُفِرَ لَهُ.

এ অবস্থায় এক লোককে শুনলেন, সূরা আল-কা-ফিরূন তিলাওয়াত করছে। তা শুনে নবী (ﷺ) বললেন, সে শিরক থেকে পবিত্র হয়ে গেছে। আরেক লোককে শুনলেন, সূরা আল-ইখলাস তিলাওয়াত করছে। তখন তিনি বললেন, তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে।[২০]

সূরা আল-ইখলাসের এত মর্যাদার কারণ কী?

সূরা আল-ইখলাস মানুষকে শিরক থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র মহান আল্লাহর একত্বের শিক্ষা দেয়। সূরাটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার শেখানো ভাষায় তাঁর পরিচয় তুলে ধরেছেন। যে পরিচয় তুলে ধরতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই এ সূরাটি নাজিল করেছেন। এ সূরার মতো কোনো সূরায় মহান আল্লাহর একত্বর বিষয়টি বর্ণিত হয়নি। এই সূরায় ৪ আয়াতের মাধ্যমে ৪টি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো– **১.** আল্লাহ এক, **২.** তিনি অমুখাপেক্ষী, **৩.** তিনি কারো জনক নন আবার তাকে কেউ জন্ম দেননি অর্থাৎ- তিনি জন্ম নেওয়া-দেওয়া থেকে পূত-পবিত্র এবং মুক্ত, **৪.** তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

উপসংহার

আল কুরআন মহান আল্লাহর পবিত্র কালাম। এর প্রত্যেকটি সূরা বা আয়াত ফজিলতপূর্ণ। কোনো কোনো আয়াত বা সূরা বিশেষ ফজিলতপূর্ণ। একটি সূরার ব্যাপারে বলা হয়েছে, ওই সূরার প্রতি অন্তরে ভালোবাসা থাকলে, সেটাই তার জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের কারণ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ! ওই সূরাটিকে কেউ মহব্বত করলে তাকে মহান আল্লাহও মহব্বত করেন, ক্ষমা করে দেন।

[১৭] *সহীহুল বুখারী- ৫০১৫; সুনানে নাসায়ী- ৯৯৫।*
[১৮] *সহীহ মুসলিম- ৮১২; সুনানে তিরমিযী- ২৯০০।*
[১৯] *নাসাঈল কিবরী- ১০৪৯৭।*
[২০] *সুনানে দারেমী- ৪৩৬৯; আহমাদ- ২৩২০৬; সুনানে কুবরা নাসায়ী- ৭৯৭৪; ফাযায়েলে কুরআন মুস্তাগফিরী- ১০৫৩।*

خطبة يوم عرفة / হজ্জের খুতবা-২০২৬

আখিরাতের প্রস্তুতিস্বরূপ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য

খতীব: শায়খ ড. আলী বিন আব্দুর রহমান আল-হুযাইফী (হাফিযাহুল্লাহ)
অনুবাদক: ড. হারুনুর রশীদ ত্রিশালী

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সকল কিছুর মালিক, অতি পবিত্র ও শান্তিদাতা। তিনি মুসলমানদের ওপর তাঁর পবিত্র গৃহের হজ্জ ফরজ করেছেন এবং এটাকে ইসলাম ধর্মের একটি রুকন বানিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বূদ নেই, যিনি সর্বজ্ঞ, পরাক্রমশালী বাদশাহ। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল ও সৃষ্টির সেরা মানব। সর্বোত্তম সালাত ও পূর্ণাঙ্গ সালাম বর্ষিত হোক তার ওপর, তার পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম এবং তার অনুসারীদের ওপর।

অতঃপর, হে মানবসকল! আপনারা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করুন; কেননা এর মাধ্যমেই আখিরাতে বান্দার মুক্তি নিশ্চিত হয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-হাজ্জের শুরুতে বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ○ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ﴾

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো; নিশ্চয়ই কিয়ামতের কম্পন এক ভয়াবহ ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী নিজ দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। আর মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়; বরং আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠিন।"[১]

আর তাকওয়া অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত হলো– সৎকাজ সম্পাদন এবং পাপ ও মন্দ কাজ বর্জনের মাধ্যমে কিয়ামত দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

[১] *সূরা আল-হাজ্জ: ১-২।*

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

"তা এই জন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন ও তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আর এই জন্য যে, কিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।"[২]

আর আখিরাতের জন্য সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি হলো তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা, একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নিকট দু'আ করা বর্জন করা। মানুষ কীভাবে মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদত বা উপাসনা করতে পারে, যা তার কোনো ক্ষতিও করতে পারে না এবং কোনো উপকারও করতে পারে না?

﴿ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ○ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾

"এটা তো চরম পথভ্রষ্টতা। সে এমন সত্তাকে ডাকে, যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়েও নিকটবর্তী; কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর!"[৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾

"আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করে, সে যেন আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।"[৪]

আর ঈমানদারদের স্লোগান বা পরিচয় হলো মহান আল্লাহর তাওহিদ (একত্ব)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

[২] *সূরা আল-হাজ্জ: ৬-৭।*
[৩] *সূরা আল-হাজ্জ: ১২-১৩।*
[৪] *সূরা আল-হাজ্জ: ৩১।*

﴿فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ○ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

"সুতরাং তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ; অতএব তোমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করো। আর সুসংবাদ দাও বিনীতদের; যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রকম্পিত হয়, যারা তাদের বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"[১]

আর এগুলোই হলো **ইসলাম ধর্মের রুকনসমূহ–** তাওহিদ তথা এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো সত্য মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমাযানের সিয়াম পালন করা এবং মহান আল্লাহর পবিত্র ঘরের হজ্জ করা। এর সাথে রয়েছে মহান আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ; আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾

"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান (জান্নাত)।"[২]

সেইসাথে মহান আল্লাহর আনুগত্যের ওপর ও কষ্টদায়ক তাকদিরের (ভাগ্যের) ওপর ধৈর্য ধারণ করা; আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

"ধৈর্যশীলদের তো তাদের পুরস্কার পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।"[৩]

এর পাশাপাশি মহান আল্লাহর নেয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা; তিনি বলেন:

﴿كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"এভাবেই আমি এগুলোকে (পশুদের) তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"[৪]

আর সৃষ্টিজগতে মহান আল্লাহর কিছু জাগতিক নীতি রয়েছে, যার ওপর বান্দার ঈমান আনা এবং তা থেকে শিক্ষা ও উপকার গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেন। আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না"[৫] এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছেন:

﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

"আর অবশ্যই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"[৬]

আর এই নীতির অন্তর্ভুক্ত হলো মহান আল্লাহর এই বাণী:

﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ﴾

"কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা জালেম ছিল; ফলে সেগুলো ছাদসহ ভেঙে পড়ে আছে এবং কত পরিত্যক্ত কূপ ও সুউচ্চ প্রাসাদ (জনশূন্য হয়ে পড়ে আছে)"[৭] এবং তিনি আরো বলেছেন:

﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾

"আর কত জনপদকে আমি অবকাশ দিয়েছি যখন তারা জালেম ছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি; আর আমারই কাছে তো ফিরে আসতে হবে।"[৮]

আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর খলীল (বন্ধু) ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-কে হজ্জের জন্য ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ○ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

[১] *সূরা আল-হাজ্জ: ৩৪-৩৫।*
[২] *সূরা আর-রহমা-ন: ৪৬।*
[৩] *সূরা আয-যুমার: ১০।*
[৪] *সূরা আল-হাজ্জ: ৩৬।*
[৫] *সূরা আল-হাজ্জ: ৩৮।*
[৬] *সূরা আল-হাজ্জ: ৪০।*
[৭] *সূরা আল-হাজ্জ: ৪৫।*
[৮] *সূরা আল-হাজ্জ: ৪৮।*

"আর মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে চড়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযক হিসেবে দিয়েছেন তার ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।"[১]

হ্যাঁ, যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানসমূহে উপস্থিত হতে পারে এবং মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। হাজীগণ দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছেন হজ্জ পালন করতে; একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর সওয়াবের আশায়। তারা এই প্রাচীন গৃহ এবং পবিত্র স্থানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ﴾

"আর মসজিদুল হারাম, যাকে আমি মানবজাতির জন্য উন্মুক্ত করেছি- সেখানে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগতদের অধিকার সমান। আর যে সেখানে অন্যায়ভাবে ইলহাদ তথা দ্বীনবিরোধী পাপ কাজের ইচ্ছে করে, তাকে আমি আস্বাদন করাব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[২]

তারা এই পবিত্র স্থানগুলোতে সমবেত হয়েছেন তাওহিদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে- একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত করার এবং মহান আল্লাহর সাথে শিরক বর্জন করার প্রত্যয় নিয়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ﴾

"আর স্মরণ করো, যখন আমি ইব্রাহিমকে সেই গৃহের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখো তওয়াফকারীদের জন্য, (সালাতে) দাঁড়ানো ব্যক্তিদের জন্য এবং রুকূ' ও সেজদাকারীদের জন্য।"[৩]

সুতরাং বায়তুল্লাহকে এমন সব কিছু থেকে পবিত্র রাখতে হবে যা তার উচ্চ মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই হজ্জের মধ্যে কোনো পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ থাকবে না; কোনো রাজনৈতিক স্লোগান ও দলীয় বা গোষ্ঠীগত আহ্বান থাকবে না; বরং এখানে থাকবে কেবলই মহান আল্লাহর সামনে বিনয়তা, মহান আল্লাহর বিধানসমূহের প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর নবী (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ; বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, অঙ্গীকার ও চুক্তিসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং অধিকারসমূহের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾

"এটাই বিধান এবং কেউ আল্লাহর পবিত্র বিধানসমূহকে সম্মান করলে তার রবের নিকট তার জন্য তা উত্তম"[৪] এবং তিনি আরো বলেছেন:

﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ﴾

"আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করলে তা তো তার অন্তরের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।"[৫]

আর হজ্জের মধ্যে মুসলিমদের পারস্পরিক পরিচিতি, সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার এক অনুপম রূপ প্রকাশ পায়; ভাষার ভিন্নতা, বর্ণের বৈচিত্র্য এবং দেশের দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও। তারা একে অপরের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হজ্জের সমস্ত বিধান পালন করে। এ জন্য তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হয় এবং তাদের কোরবানির পশুর গোশত থেকে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রদের আহার করায়। আর তখন তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়- কর্মে ইহসান করা এবং কথায় সত্যবাদী হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আর তোমরা পরিহার করো মিথ্যা কথা।"

আর আরাফাতের এই ময়দানেই আল্লাহ তা'আলা আপনাদের (হাজীদের) নিয়ে তাঁর ফেরেশতাদের সাথে গৌরব করেন। আর এটি সেই মহান স্থান, যেখানে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেছিলেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا﴾

[১] *সূরা আল-হাজ্জ: ২৭-২৮।*
[২] *সূরা আল-হাজ্জ: ২৫।*
[৩] *সূরা আল-হাজ্জ: ২৬।*
[৪] *সূরা আল-হাজ্জ: ৩০।*
[৫] *সূরা আল-হাজ্জ: ৩২।*

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[১]

সুতরাং আপনারা হেদায়েতের নবী (ﷺ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করুন। তিনি আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসরের সালাত একত্রে কসর করে আদায় করেছিলেন। এরপর তিনি সেখানেই অবস্থান করে মহান আল্লাহর যিকিরে মগ্ন ছিলেন; সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অতঃপর তিনি মুযদালিফার দিকে রওনা হন, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾

"তারপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশআরুল হারামের (মুযদালিফা) কাছে আল্লাহর যিকির করো। আর তাকে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের হেদায়েত দিয়েছেন, যদিও এর আগে তোমরা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।"[২]

এরপর ঈদের দিন সকালে তিনি মিনার দিকে রওনা হন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"তারপর তোমরা ফিরে যাও যেখান থেকে মানুষ ফিরে যায় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩]

সেখানে তিনি জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করেন, তার কোরবানির পশু যবাই করেন এবং মাথা মুণ্ডন করেন- তবে চুল ছোট করারও অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহতে তওয়াফে ইফাদাহ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾

"তারপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে।"[৪]

এর পাশাপাশি (হজ্জের পুরো সময়টায়) প্রশান্তি, নম্রতা ও কোমলতা বজায় রাখার ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে; ধাক্কাধাক্কি ও হুড়োহুড়ি থেকে দূরে থাকতে হবে এবং শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও আয়োজক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাবলী মেনে চলতে হবে। গ্রুপ ভিত্তিতে চলাচলের নিয়ম ও যাতায়াতের নির্ধারিত পথ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে; যাতে সামগ্রিক কল্যাণ অর্জিত হয়, ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা এড়ানো যায়, জীবন রক্ষা পায় এবং হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা পালন সবার জন্য সহজ ও সাবলীল হয়।

আর মিনাতে অবস্থানকালে বেশি বেশি মহান আল্লাহর যিকির করা মুস্তাহাব। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾

"অতঃপর যখন তোমরা তোমাদের হজ্জের কার্যাদি সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো- যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের স্মরণ করতে অথবা তার চেয়েও তীব্রভাবে স্মরণ করো"[৫] এবং আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে (যিলহাজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) হাজীগণ তিনটি জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ করবেন; প্রতিদিন প্রতিটি জামরায় সাতটি করে পাথর মারবেন। (মিনায়) তেরো তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করা সবচেয়ে উত্তম, তবে বারো তারিখে (পাথর নিক্ষেপ শেষ করে) তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াও জায়েয। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

"আর তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো নির্দিষ্ট দিনগুলোতে। অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করে দুই দিনে চলে যাবে, তার কোনো পাপ নেই; আর যে ব্যক্তি বিলম্ব করবে, তারও কোনো পাপ নেই- তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয়

[১] *সূরা আল-মায়িদাহ: ৩।*
[২] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৯৮।*
[৩] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৯৯।*
[৪] *সূরা আল-হাজ্জ: ২৯।*
[৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ২০০।*

করো এবং জেনে রাখো, তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে।"[১]

আর স্বদেশে রওনা হওয়ার পূর্বে বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে।

মূলত আল্লাহ তা'আলা নিজেই আপনাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে আপনাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা বা কঠিন নিয়ম চাপিয়ে দেননি; এটি আপনাদের পিতা ইব্রাহিমের মিল্লাত (আদর্শ)। তিনি পূর্বেই আপনাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও, যাতে রাসূল (ﷺ) আপনাদের জন্য সাক্ষী হন এবং আপনারা সাক্ষী হন মানবজাতির জন্য। সুতরাং আপনারা সালাত কায়েম করুন, যাকাত প্রদান করুন এবং মহান আল্লাহকে অবলম্বন করুন; তিনিই আপনাদের অভিভাবক। কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী তিনি!

আর মহান আল্লাহকে অবলম্বন করার অন্যতম উপায় হলো– ব্যক্তি তার রবের নিকট বেশি বেশি দু'আ ও প্রার্থনা করবে; বিশেষ করে হজ্জের পবিত্র স্থানগুলোতে, কারণ এগুলো দু'আ কবুল হওয়ার মোক্ষম সময় ও স্থান। হাদীসে এসেছে– (সর্বোত্তম দু'আ হলো আরাফাহ দিবসের দু'আ। আর আরাফাহ দিবসে আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা বলেছি তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।"[২] তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ﴾

"আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত (দু'আ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৩] তিনি আরো বলেছেন:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِمَّا كَسَبُوْا وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴾

"আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে- হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন। এদের জন্যই রয়েছে তাদের উপার্জনের অংশ; আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।"[৪]

হে আল্লাহ! আপনি হাজীদের দু'আ ও হজ্জের যাবতীয় আমল কবুল করে নিন, তাদের সকল বিষয়কে সহজ করে দিন, তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং তাদের সহীহ-সালামতে, পুণ্যময় ও সফলকাম অবস্থায় নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! আপনি মুসলিমদের অবস্থা সংশোধন করে দিন এবং সত্যের ওপর তাদের ঐক্যবদ্ধ করুন। হে আল্লাহ! আপনি মুসলিমদের অবস্থা সংশোধন করে দিন এবং সত্যের ওপর তাদের ঐক্যবদ্ধ করুন। হে আল্লাহ! আপনি মুসলিমদের অবস্থা সংশোধন করে দিন এবং সত্যের ওপর তাদের ঐক্যবদ্ধ করুন। আপনিই তাদের সমস্ত বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করুন এবং তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার সার্বিক অবস্থার সংশোধন করে দিন, হে সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক!

হে আল্লাহ! আপনি খাদেমুল হারামাইন শারিফাইন বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ এবং তার নায়েব প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমানকে উত্তম কাজের তাওফিক দান করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন; কারণ তারা আপনার বান্দাদের প্রতি ইহসান করেছেন, হাজীদের জন্য হজ্জ পালন সহজ করেছেন এবং দুই পবিত্র মসজিদ ও সেখানে আগমনকারীদের সেবায় অত্যন্ত উদারহস্তে ব্যয় করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের মাধ্যমে আপনার দ্বীনকে বিজয়ী করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাদের মাধ্যমে আপনার দ্বীনকে বিজয়ী করুন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মদ-এর ওপর এবং তার পরিবার ও সাহাবীদের ওপর অজস্র সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন। *[সমাপ্ত]*

---

[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ২০৩।*
[২] *সুনানে তিরমিযী- ৯৫০, ৩৪১৪, সহীহ, ৩৫৮৫, হাসান।*
[৩] *সূরা গা-ফির: ৬০।*
[৪] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ২০১-২০২।*

مقالة رئيسة / প্রধান রচনা

দার্‌স-তাদরীস ও ইল্‌মী হালাকার পুনর্জাগরণ: বাস্তবতা, সংকট ও দাওয়াতী রূপরেখা

আব্দুল হাকীম মাদানী*

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য –আলহামদু লিল্লাহ। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর।

সৌদি আরবসহ আরব বিশ্বের জনসাধারণের মাঝে ইল্‌ম অর্জন ও বিতরণের যে মূলধারা প্রচলিত, তা হলো দারস-তাদরীস ও ইল্‌মী হালাকা। মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই শিক্ষাব্যবস্থায় দৈনন্দিন সালাতের পর সংক্ষিপ্ত দারস, সাপ্তাহিক ও মাসিক ইল্‌মী হালাকা, এমনকি মৌসুমভিত্তিক ইল্‌মী আসর অনুষ্ঠিত হয়। এসব আসরে নেই কোনো জাঁকজমক, নেই অপ্রয়োজনীয় খরচ বা বাহ্যিক চাকচিক্য; বরং এতে থাকে আন্তরিকতা, ধারাবাহিকতা এবং গভীরভাবে দ্বীন শেখার পরিবেশ। একজন সাধারণ মুসলিম এই ধারাবাহিক হালাকায় অংশগ্রহণ করে ধীরে ধীরে কুরআন, হাদীস, 'আক্বীদাহ্ ও ফিকহে প্রাথমিক থেকে গভীর জ্ঞান পর্যন্ত অর্জন করতে পারে। এই পদ্ধতিই ইতিহাস জুড়ে আলেম তৈরির মূল মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।

কিন্তু ভারত উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, এই স্বাভাবিক ও ফলপ্রসূ পদ্ধতির জায়গা অনেকাংশে দখল করে নিয়েছে ওয়াজ মাহফিলকেন্দ্রিক সংস্কৃতি। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র এখন ওয়াজ মাহফিল, সম্মেলন, ইজতেমা ও কনফারেন্সের ছড়াছড়ি। অনেক ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ ব্যয় করে বড় বড় আয়োজন করা হয়, যেখানে মানুষের ভিড় হয়, আবেগ সৃষ্টি হয়, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ইল্‌ম অর্জনের ধারাবাহিকতা তৈরি হয় না। ওয়াজ শুনে মানুষ সাময়িকভাবে প্রভাবিত হলেও, নিয়মিত শিক্ষার অভাবে সেই প্রভাব স্থায়ী হয় না এবং দ্বীনের গভীর উপলব্ধিও গড়ে ওঠে না।

এ অবস্থার একটি বড় কারণ হলো মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন। এখন অনেকেই তাৎক্ষণিক আবেগ ও প্রভাবকে বেশি গুরুত্ব দেয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি অধ্যবসায় ও নিয়মিত ইল্‌ম অর্জনের ধৈর্য কমে গেছে। অন্যদিকে, কিছু আলেমও স্থানীয় মসজিদভিত্তিক দারসকে গুরুত্ব না দিয়ে দূর-দূরান্তে ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণে বেশি আগ্রহী হন, যেখানে সম্মানী ও জনপ্রিয়তার সুযোগ বেশি থাকে। ফলে যাদের নিজ এলাকার মানুষকে নিয়মিত ইল্‌ম দেওয়ার কথা, তারা সেই দায়িত্ব থেকে অনেকটা সরে যাচ্ছেন। এতে মসজিদভিত্তিক দারস ও ইল্‌মী হালাকা দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং সাধারণ মানুষ স্থায়ী ইল্‌ম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই প্রবণতার ফলে সমাজে একধরনের উপরিভাগী ধর্মীয় চেতনা তৈরি হচ্ছে। মানুষ দ্বীন সম্পর্কে অনেক কথা শুনছে, কিন্তু সুসংগঠিতভাবে শিখছে না। 'আক্বীদাহ্, ফিকহ ও উসূলের মতো মৌলিক বিষয়গুলোতে দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এর প্রভাব আরো ভয়াবহ হতে পারে। ইলমী শূন্যতা তৈরি হবে, ভুল 'আক্বীদাহ্ ও বিদআত ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রকৃত আলেমের সংখ্যা কমে যাবে। তখন দ্বীন মানুষের কাছে জ্ঞানভিত্তিক জীবনব্যবস্থা না হয়ে আবেগনির্ভর একটি বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

তবে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ বন্ধ নয়। সর্বপ্রথম প্রয়োজন মসজিদভিত্তিক দারস ও ইল্‌মী হালাকা পুনরুজ্জীবিত করা। প্রতিদিন সালাতের পর সংক্ষিপ্ত দারস, সাপ্তাহিক নির্ধারিত হালাকা এবং মাসিক বিশেষ শিক্ষাচক্র চালু করা যেতে পারে। এসব দারসকে পরিকল্পিত ও পাঠ্যসূচিভিত্তিক করতে হবে, যাতে একজন শিক্ষার্থী ধাপে ধাপে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। পাশাপাশি আলেমদেরও তাদের অগ্রাধিকার ঠিক করতে হবে জনপ্রিয়তার চেয়ে ইল্‌ম প্রচারকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং নিজ এলাকার মানুষের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও সচেতনতা তৈরি করতে হবে যে, শুধু ওয়াজ শোনা দ্বীন শেখার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং নিয়মিত হালাকায় অংশগ্রহণই প্রকৃত ইল্‌ম অর্জনের পথ। বড় বড় মাহফিলে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, তার একটি অংশ যদি মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে সমাজ অনেক বেশি উপকৃত হবে। পাশাপাশি তরুণদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রশ্নোত্তরভিত্তিক ক্লাস, আলোচনা সভা এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অনলাইন দারস চালু করা যেতে পারে।

তবে ভারসাম্য রক্ষা করাও জরুরি। ওয়াজ মাহফিল সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নয়; এটি অনেক সময় গাফেল মানুষকে দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনে এবং সাধারণ মানুষের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করে। কিন্তু এটিকে চূড়ান্ত লক্ষ্য না ভেবে একটি প্রাথমিক ধাপ হিসেবে দেখা উচিত। প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত ইলমী হালাকা ও ধারাবাহিক দারসের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা।

এই প্রেক্ষাপটে দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। দাওয়াতী কাজ কেবল কিছু বক্তব্য দেওয়া বা মানুষকে সাময়িকভাবে প্রভাবিত করার নাম নয়; বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি, সুপরিকল্পিত ও ইল্‌মভিত্তিক প্রক্রিয়া, যার লক্ষ্য

* *পরিচালক, আল-ইল্‌ম ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।*

মানুষের 'আক্বীদাহ্, আমল ও চরিত্রে স্থায়ী পরিবর্তন আনা। তাই দাওয়াতকে নতুনভাবে সাজানো সময়ের দাবি।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি গুরুত্ব পায়, তা হলো উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা। দাওয়াতী কাজের মূল লক্ষ্য হতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানুষকে সত্যিকার অর্থে দ্বীনের পথে আনা। এখানে জনপ্রিয়তা, অনুসারীর সংখ্যা বা আর্থিক লাভ কোনো লক্ষ্য হতে পারে না। যখন দাওয়াতের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ থাকে, তখন পদ্ধতিও স্বাভাবিকভাবে ইল্মভিত্তিক ও স্থায়ী ফলদায়ক হয়। কিন্তু উদ্দেশ্যে যদি খুঁত থাকে, তাহলে দাওয়াত আবেগনির্ভর হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘমেয়াদে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনে না।

দাওয়াতী কাজের একটি মৌলিক করণীয় হলো ইল্মকে কেন্দ্র করে কার্যক্রম পরিচালনা করা। প্রতিটি এলাকায় মসজিদভিত্তিক নিয়মিত দারস চালু করতে হবে। কুরআনের তাফসীর, সহীহ হাদীস, 'আক্বীদাহ্ ও ফিকহ এসব বিষয়ে ধাপে ধাপে পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। দাওয়াতের নামে শুধুমাত্র বক্তৃতা নয়; বরং একটি শিক্ষা-প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে হবে। একজন ব্যক্তি যেন এক বছর, দুই বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে শিখতে পারে এই ধরনের পরিকল্পনা জরুরি। এভাবেই একজন সাধারণ মুসলিম ধীরে ধীরে সচেতন, পরিপক্ব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে।

একইসাথে দাওয়াতী কাজকে স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রত্যেক আলেম ও দাঈ'র উচিত নিজের এলাকার মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া। দূর-দূরান্তে গিয়ে বড় বড় মাহফিলে অংশগ্রহণ করার চেয়ে নিজ এলাকার মসজিদে নিয়মিত দারস দেওয়া অনেক বেশি ফলপ্রসূ। এতে মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাদের সমস্যা জানা যায় এবং বাস্তবসম্মত সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়। দাওয়াত তখন একটি জীবন্ত প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়, কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়।

তরুণ সমাজকে দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়। বর্তমান প্রজন্ম প্রশ্ন করতে চায়, বুঝতে চায়, যুক্তি খুঁজে। তাই তাদের জন্য আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও চিন্তাশীল সেশন আয়োজন করতে হবে। তাদেরকে কেবল শ্রোতা বানিয়ে রাখলে চলবে না; বরং দাওয়াতের অংশীদার বানাতে হবে। যারা শিখবে, তাদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতের দাঈ' ও আলেম তৈরি হবে।

দাওয়াতী কাজে প্রযুক্তির ব্যবহারও এখন অপরিহার্য। অনলাইন দারস, রেকর্ডেড ক্লাস, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যবহুল কন্টেন্ট এসবের মাধ্যমে ইল্মকে সহজলভ্য করা যায়। তবে এখানে সতর্কতা হলো– কন্টেন্ট যেন শুধু আকর্ষণীয় না হয়ে সত্যিকার অর্থে উপকারী ও ইলমসমৃদ্ধ হয়।

এবার বর্জনীয় দিকগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় বর্জনীয় বিষয় হলো দাওয়াতকে বিনোদনে পরিণত করা। যদি দাওয়াতী প্রোগ্রাম শুধুমাত্র আবেগ সৃষ্টি, হাস্যরস বা চমক প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তা দ্বীনের উদ্দেশ্য পূরণ করে না। মানুষ সাময়িকভাবে আনন্দ পেলেও তাদের জীবনে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন আসে না। তাই দাওয়াতের প্রতিটি ধাপেই ইল্ম ও হিকমাহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আরো একটি বর্জনীয় দিক হলো অতিরিক্ত জাঁকজমক ও অপচয়। দাওয়াতের নামে বড় মঞ্চ, ব্যানার, অপ্রয়োজনীয় খরচ এসব থেকে বিরত থাকা জরুরি। কারণ এই খরচ যদি ইল্মী কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়, তাহলে তার সুফল অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে। সরলতা ও আন্তরিকতা দাওয়াতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, বাহ্যিক চাকচিক্য নয়।

এছাড়াও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা একটি বড় সমস্যা। দাওয়াত যদি কোনো ব্যক্তির জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাহলে সেই ব্যক্তি না থাকলে কার্যক্রমও দুর্বল হয়ে যায়। তাই ব্যক্তি নয়; বরং পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দাওয়াত গড়ে তুলতে হবে। একটি সুসংগঠিত টিম, নির্ধারিত সিলেবাস এবং ধারাবাহিক কার্যক্রম এসবই দাওয়াতকে স্থায়ী করে।

ভবিষ্যতের দাওয়াতী রূপরেখা হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ। ওয়াজ মাহফিলকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়, তবে এর ভূমিকা সীমিত রাখতে হবে। এটি মানুষের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করবে, আর সেই আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে দারস ও হালাকার দিকে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ- ওয়াজ হবে সূচনা, আর হালাকা হবে পরিপূর্ণতা।

পরিশেষে বলতে চাই, দাওয়াতী কাজের সফলতা নির্ভর করে ধারাবাহিকতা, পরিকল্পনা এবং ইল্মের ওপর। যদি আমরা আমাদের দাওয়াতকে ইল্মকেন্দ্রিক করতে পারি, মসজিদকে শিক্ষা-কেন্দ্রে রূপান্তর করতে পারি এবং আলেম ও সাধারণ মানুষের মাঝে একটি জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি, তাহলেই ইন্ শা-আল্লাহ সমাজে প্রকৃত পরিবর্তন আসবে। অন্যথায় আমরা যত বড় আয়োজনই করি না কেন, তা সাময়িক প্রভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

অতএব, এখন সময় এসেছে আমাদের দাওয়াতী কাজকে নতুনভাবে ভাবার, আবেগ থেকে ইল্মের দিকে, অনুষ্ঠান থেকে ধারাবাহিক শিক্ষার দিকে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে উম্মাহকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অগ্রসর হওয়ার। তবেই ইন্ শা-আল্লাহ আমরা একটি জ্ঞানভিত্তিক, সচেতন ও শক্তিশালী মুসলিম সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হক্ব বুঝার তাওফীক্ব দান করুন এবং আমাদের দাওয়াতী প্রচেষ্টাকে কবুল করুন –আমীন।

مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধ

‘আশুরায়ে মুহার্‌রম, কারবালা ও মুসলিম বিভক্তির সূচনা

সংকলনে– মুহাম্মাদ আইয়ুব বিন ইদু মিয়া

ভূমিকা : মুসলিম সমাজে ‘আশুরায়ে মুহার্‌রাম একটি সুপরিচিত বিষয়। বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায়ের কাছে বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো ‘আশুরায়ে মুহার্‌রাম। তাই দেখা যায় অনেকেই এ দিনটিকে শুধুমাত্র শিয়াদের বিশেষ দিন মনে করে থাকেন। ‘আশুরায়ে মুহার্‌রামে সুন্নী মুসলিমদের জন্যও কিছু করণীয় রয়েছে।

✶ **‘আশুরা অর্থ :** ‘আশুরা আরাবী শব্দ। যার অর্থ হলো দশ। মুহার্‌রম মাসের দশম তারিখকে ‘আশুরা বলা হয়।[১]

✶ **‘আশুরার তাৎপর্য ও সিয়াম পালন :** বছরে মাসের সংখ্যা ও গণনা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন :

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আর তা আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি হারাম বা সম্মানিত মাস। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং তোমরা এর মধ্যে নিজেদের ওপর যুল্‌ম ও অত্যাচার করো না।”[২]

আবূ মূসা আশ‘আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘আশুরার দিনকে ইয়াহূদীরা ঈদের দিন হিসেবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো।[৩]

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় হিজরত করে ইয়াহূদীদেরকে ‘আশুরার সিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, ‘এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ তা‘আলা মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর ক্বাওমকে নাযাত দিয়েছিলেন এবং ফিরআউন ও তার লোকেদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসেবে মূসা (আলাইহিস সালাম) এ দিন সিয়াম পালন করেন। অতএব আমরাও এ দিন সিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর (আদর্শের) অধিক হক্বদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি সিয়াম রাখেন ও সকলকে সিয়ামা পালনের নির্দেশ দেন (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৪]

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহূদী ও নাসারাগণ ১০ মুহার্‌রম ‘আশুরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইন্‌শা-আল্লাহ, আমরা ৯ মুহার্‌রমসহ সিয়াম রাখব।’ রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহার্‌রম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৫]

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, ‘তোমরা ‘আশুরার দিন সিয়াম পালন করো এবং ইয়াহূদীদের খেলাফ করো। তোমরা ‘আশুরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন সিয়াম পালন কর।’[৬]

যেহেতু মুহার্‌রম মাসে বেশি সিয়াম রাখার অনুমতি সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় তাই তিন দিন সিয়াম রাখা যেতে পারে।

শুধু দশম তারিখে একটি অথবা আগের বা পরের সাথে মিলিয়ে দু’টি, অথবা আগে ও পরেসহ মোট তিনটি সিয়াম রাখা যেতে পারে।[৭] এটাই ‘আশুরা উপলক্ষ্যে শরিয়তসম্মত ‘ইবাদত।

---

[১] *মিরআতুল মাফাতিহ- ৭/৪৫ পৃ.।*
[২] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৬।*
[৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৩১।*
[৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৩০।*
[৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৩৪।*
[৬] *বায়হাক্বী- ৪র্থ খণ্ড, ২৮৭ পৃ.; সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্- হা. ২০৯৫, ২/২৯০ পৃ.।*
[৭] *ইকতিযাউ সিরতিল মুস্তাকীম- ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ), ১/৪৬৯ পৃ.; যাদুল মা‘আদ- ইবনুল কাইয়্যিম, ২/৭৫ পৃ.; ফাতহুল বারী- ইবনু হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ), ৪/৩১১ পৃ.।*

★ 'আশুরার সিয়াম পালনের ঐতিহাসিক দলিল :

(১) 'আশুরা সিয়াম ফিরা'আওনের কবল থেকে নাযাতে মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর শুকরিয়া হিসেবে পালিত হয়। **(২)** এই সিয়াম মূসা (আলায়হিস সালাম) ও 'ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর শরিয়তে চালু ছিল। **(৩)** আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে কাফিররাও 'আশুরার সিয়াম পালন করতো। **(৪)** ২য় হিজরিতে রমাযানের সিয়াম ফর্‌য হওয়ার আগ পর্যন্ত এই সিয়াম সকল মুসলিমদের জন্য পালিত নিয়মিত সিয়াম হিসেবে গণ্য হত। **(৫)** রমাযানের সিয়াম ফর্‌য হওয়ার পর এই সিয়াম ঐচ্ছিক নিয়মে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিয়মিত এই সিয়াম ঐচ্ছিক হিসেবেই পালন করতেন।

★ ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও মুসলিমদের দলাদলির সূচনা : মহান আল্লাহর জমিনে যখন তাওহীদের পতাকা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উড়তে শুরু করল, তখন ইসলাম ও মুসলিমদের চিরশত্রু ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানরা বসে না থেকে ইসলাম ও মুসলিম জাতি ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন প্রকার চক্রান্ত ও পলিসি করা শুরু করল। যার পরিণতি ইসলামী বিশ্বে প্রথম শিয়া ও সুন্নী রাজনৈতিক বিভাজন। যার সূত্রপাত ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ইরান বিজয়ের পরবর্তীকালে ইরানী রাজকীয় পরিবারের সদস্যদের দাস-দাসী হিসেবে মুসলিমদের মধ্যে বণ্টনকৃত হলে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের সম্মানের কারণে তিনি তাদেরকে দাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার না করে আযাদ করে দেন। এর ফলে এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র প্রতি আলাদা সম্মান ও ভক্তি পোষণ করতো এবং অন্যান্য সহাবীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো। এর অন্যতম পরিণতি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাতবরণ। যা মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র গোলাম আবূ লুলু নামক নিকৃষ্ট ইরানী অগ্নিপূজারীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল।

আর ইয়েমেনের অধিবাসী মুনাফিক্ব 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাবার (সাবায়ী বলে পরিচিত) ইসলামী পোশাক ধারণা করা ছিল সবচাইতে মারাত্মক। সে একজন ইয়াহূদীর সন্তান ছিল। এই মুনাফিক্বের মুসলিমরূপে আবির্ভাব হওয়ায় পরে ইসলামের মূল শিকড় কাটার জন্য সর্বপ্রথম পরিকল্পনা ছিল তৃতীয় খলীফাহ্ 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করা। তাই নিরপরাধ খলীফার বিরুদ্ধে মিথ্যা কিছু অপবাদ দেয় ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র রাজত্বকালে মুসলিমরূপী 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা মদীনাতে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে নানা অসংলগ্ন কথাবার্তা প্রচার করতে শুরু করে। মুসলিম সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে ডেকে এনে কড়া ভাষায় ধমক দেয়ায় সে মদীনা দূরবর্তী শহর কূফায় চলে যায় এবং ইরান, ইরাকে সে তার দা'ওয়াত পুরোদমে করতে থাকে যেখানে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ভক্ত ও সম্মান করার বহু লোক বিদ্যমান।

ইরান ও মিসর থেকে এ ধরনের মুসলিম নামধারী বেশ কিছু লোক মদীনায় অবস্থান করে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বাসভবন ঘেরাও করে রেখেছিল, খলীফাকে মসজিদে যেতে বাধা দিচ্ছিল। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট বারংবার এদের বিরুদ্ধে অনুমতি প্রার্থনা করা সত্ত্বেও তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি; বরং তিনি বলতে বাধ্য হন। আপনারা যদি আমাকে উত্যক্ত করতে থাকেন তবে আমি তাদের জন্য আমার দরজা খুলে দেব। আমি মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে আছি। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা উত্তম বিচার করবেন।

মাত্র ১৪ জন কুচক্রী সাবায়ী দল তৃতীয় খলীফাহ্ 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করেছিল হিজরি ৩৫ সালে। তিনি এ হত্যাকে নিজেই এ বলে মেনে নিয়েছিলেন যে, "আমার কারণে মুসলিমদের মাঝে যেন রক্তপাত ও খুনাখুনি না ঘটে।" তিনি এ বিদ্রোহের প্রতিবাদকারীদেরকে রক্ত প্রবাহিত হবে বলে সবাইকে চলে যেতে বলেন। তাঁর এ শাহাদাতের দ্বারা ফিৎনার দরজা উন্মুক্ত হয় এবং মুসলিমদের ঐক্যের মাঝে ফাটল ধরে।

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এদের হাতে শাহীদ হলেন, এরপর 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও সর্বশেষ হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। এসব ঘটনায় মুসলিমদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মুসলিম জাতিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলা হলো।[১]

[১] *হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মূল হত্যাকরী কে?- ড. ইব্রাহীম 'আলী, ৩-৪ পৃ.।*

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাত বরণের পর সবার ঐকমত্যে চতুর্থ খলীফাহ্ নির্বাচিত হলেন 'আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কিন্তু এ কুচক্রীদল 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সৈন্যদলে কৌশলে প্রবেশ করে এবং তলে তলে তাদের কুমতলব চালাতেই থাকে।

এদিকে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন সিরিয়ার গর্ভনর নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বংশের খলীফাহ্ 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হত্যার সঙ্গে জড়িত খুনীদের বিচার করার জন্য 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র প্রতি জোরালো দাবি ও চাপ সৃষ্টি করেন। তবে তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফাত বা তাঁকে অস্বীকার অথবা খলীফার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার বিদ্রোহ করেননি।

মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : আপনি কি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফাতের ব্যাপারে বিরোধিতা করছেন? আপনি কি তাঁর অনুরূপ? উত্তরে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমি অবশ্যই জানি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার চাইতে উত্তম এবং খিলাফাতের বেশি হক্বদার। কিন্তু তোমরা কি জান না? 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মাযলূম অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে? আর আমি তাঁর চাচার ছেলে, আমি তো শুধুমাত্র তাঁর খুনের বদলা চাই।[১]

নিঃসন্দেহে একজন আত্মীয় মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খুনীদের বিচার দাবি করার অধিকার ছিল। কিন্তু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন বড় মানের রাজনীতিবিদ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি বললেন : রাষ্ট্রের অবস্থা বর্তমানে নাজুক। এ পরিস্থিতে খুনীদের বিচারকার্য বাস্তবায়ন করা কঠিন। প্রথমে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও ফিৎনা আয়ত্বে আনতে হবে তারপর বিচার করা হবে।

অন্যদিকে পরিস্থিতি শান্ত করার উদ্দেশে কিছু সহাবার পরামর্শে মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মক্কা থেকে বাসরার দিকে রওয়ানা হন। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সাথে আলোচনার পর তিনি মদীনায় ফিরে যাওয়ার সংকল্প করেন। কিন্তু ঐ কুচক্রীদলটি রাতের অন্ধকারে অতর্কিতভাবে মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র সঙ্গীদের ওপর হামলা চালায়। যার ফলে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

ঐ দিকে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মতের উপরেই অনঢ় থাকেন। অন্যদিকে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বাধ্য করার জন্য মদীনা থেকে বের হন। সিরিয়ার সিফফীন নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে দু' দলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরিশেষে দু'দলের মাঝে সন্ধি দ্বারা সমস্যার সমাধান হয়। এ সন্ধিকে কেন্দ্র করে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র দলের লোকেরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি শিয়া যার অর্থ নিজের দল। আর অপরটি খারিজী তথা বিদ্রোহী দল। আর এটাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম দলাদলির সূচনা!

এই ইয়াহূদী মুনাফিক্বী দলটি গোপনে গোপনে ইসলামের বিদ্বেষ আরো শক্তিশালী করার জন্য ষড়যন্ত্র আঁটে। তারা তিনজন মানুষকে নিযুক্ত করে তিনজনকে হত্যা করার জন্য। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করার জন্য খারিজী 'আব্দুর রহমান ইবনু মুলজিমকে এবং অপর দু' জনকে মু'আবিয়াহ্ ও 'আমর ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করার জন্য। কিন্তু ইবনু মুলজিম 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করতে সক্ষম হলেও অপর দু'জন ব্যর্থ হয়। এটা ছিল ৪০ হিজরির ঘটনা।

এরপর ঐ দলটি এ হত্যার দায়ভার চাপিয়ে দেয় মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ওপর। যেহেতু দু'জনের মাঝে রাজনৈতিক সমস্যা ছিল বিদ্যমান। তাই বাহ্যিকভাবে সাধারণ মানুষ পড়ে গেল ধোঁকায়।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হত্যার পর খিলাফাতের দায়িত্ব নিলেন তাঁর বড় ছেলে হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি মাত্র ছয় মাস খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি মুসলিমদের দু'টি দলের মাঝের ফিৎনাকে নিভানোর জন্য নিজে ও ছোট ভাই হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সঙ্গে করে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট গিয়ে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। আর এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভবিষ্যতবাণীর বাস্তবায়ন। কারণ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "নিশ্চয় আমার এ সন্তান (হাসান) সাইয়্যেদ (সর্দার)। আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা মুসলিমদের বিরাট দু'টি দলের মাঝে আপোস করে দিবেন।"[২]

এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই চলতে থাকে। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাসান ও

[১] *তারীখুল ইসলাম- ইমাম যাহাবী, ১/৪৬৫ দ্র.; সিয়ার আ'লআমুল নুবালা- ৩/১৪০; বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া- ইবনু কাসীর, ৮/১৩৮ ও তারীকে দিমাশক- ৫৯/১৩২।*

[২] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সম্মান করতেন। প্রতি বছর তারা মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট যেতেন এবং তিনি তাঁদেরকে এক লক্ষ করে দিরহাম দিতেন। এছাড়া একবার চার লক্ষ দিরহাম পুরস্কার দেন। হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মৃত্যুর পর হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট যেতেন এবং তিনি তাঁকে আহলে বাইতের (নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর পরিবারদের) যথাযথ সম্মান দান ও মহব্বত করতেন।

হিজরি ৫০ সালে মাদীনাতু কায়সার শহরে (অর্থাৎ- রোম সম্রাটের শহর ইস্তাম্বুলে) বিজয়ের জন্য সৈন্যদল পাঠানোর সময় মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে পাঠালে তিনি তাতে শারীক হন। আর সে সেনাদলের সেনাপতি ছিলেন মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ছেলে ইয়াযিদ ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ যুদ্ধ সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে বলেন : "আমার উম্মাতের যে প্রথম সৈন্যদলটি কায়সার শহরে (ইস্তাম্বুলে) যুদ্ধ করবে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত।"[১]

নিঃসন্দেহে এ হাদীসটি ইয়াযিদ ইবনু মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে যারা মিথ্যা অপপ্রচার করে থাকে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত দলিল।[২]

★ হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কূফায় যাত্রা এবং সহাবীগণের ভূমিকা : হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কূফায় রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ও 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ন্যায় জলীলুল ক্বদর সহাবীগণ তাঁকে বারবার নিষেধ করেন এবং 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সাথে কূফাবাসীদের পূর্বেকার বিশ্বাসঘাতকতার কথা তাঁকে জোরালোভাবে স্মরণ করিয়ে দেন। ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু 'উমারের বারবার তাকিদ সত্ত্বেও যখন তিনি ফিরলেন না, তখন ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, যদি ইরাকীরা সত্য সত্যই আপনাকে চায়, তবে তারা দলেবলে এসে আপনাকে সসম্মানে নিয়ে যাক। কিন্তু তারা তো কেবল চিঠি দিয়েছে। কিন্তু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোনো কথা শুনলেন না। অবশেষে বারবার অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে তিনি বললেন, ইরাকীরা প্রতারক। আপনি তাদের ধোঁকায় পড়বেন না। এরপরেও যদি আপনি নিতান্তই যেতে চান, তবে আমার অনুরোধ আপনি মহিলা ও শিশুদের নিয়ে যাবেন না। আমি ভয় পাচ্ছি যে, 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যেভাবে তার স্ত্রী ও সন্তানদের সামনে নিহত হয়েছেন, আপনিও তেমনি ওদের চোখের সামনে নিহত হবেন।' এরপর 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে তাঁকে বুঝালেন। কিন্তু তাতেও তিনি ফিরলেন না। তখন তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বুক ভাসিয়ে শেষ বিদায় দেন এই বলে, 'হে নিহত! মহান আল্লাহর যিম্মায় আপনাকে সোপর্দ করলাম।' এইভাবে একে একে 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ির, মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়্যাহ্, আবূ সা'ঈদ খুদরী, আবূ ওয়াক্বিদ লায়সী, জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ, মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ, 'উমরাহ্ বিনতু 'আব্দুর রাহমান, আবূ বাক্বর ইবনু 'আব্দুর রহমান, 'আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফার, 'আম্মার ইবনু সা'ঈদ ইবনুল 'আস প্রমুখ সহাবীগণ তাঁকে কূফায় না যাওয়ার অনুরোধ করেন। বিশেষ করে আবূ বাক্বার ইবনু আব্দুর রহমান এসে তাঁকে বলেন, 'ওরা দুনিয়ার গোলাম। যারা আপনাকে সাহায্যের ওয়াদা করেছে, ওরাই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।' কিন্তু সবাইকে নিরাশ করে তিনি জবাব দেন, 'আল্লাহ তা'আলা যা ফায়সালা করবেন, তাই-ই হবে।' এই জবাব শুনে আবূ বাক্বার বলে উঠলেন, 'ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রা-জি'উন।' হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিহত হওয়ায় সহাবায়ি কিরাম চরমভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত হন।[৩]

★ কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা : খলীফাহ্ মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ছেলে ইয়াযীদকে খালিফাহ্ হিসেবে নির্বাচন করেন। তার বায়'আত গ্রহণ করার জন্য গভর্নরদেরকে ফরমান জারি করেন। মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মৃত্যুর পর হিজরি ৬০ সালের রজব মাসের ১৫ তারিখ ইয়াজীদ খিলাফাতের দায়িত্বভার হাতে নিয়ে খিলাফাতের কাজে আঞ্জাম দিতে থাকেন।

এদিকে মদীনার অধিকাংশ মানুষ ইয়াযীদের বায়'আত গ্রহণ করলেও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বায়'আত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। এ সুযোগে ঐ সাবায়ী কুচক্রীদলটি কূফা থেকে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পত্রের পর পত্র পাঠাতে থাকে। চিঠির বিষয় হলো আমরা

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৭০৭।*
[২] *'আশুরা ও কারবালা- ১৯-২৪ পৃ.।*
[৩] *আশুরায়ে মুহার্‌রম ও আমাদের করণীয়- ১৪ পৃ.।*

ইয়াযীদকে মানি না এবং আমরা আপনার হাতে বায়‘আত (আনুগত্যের শপথ) করব। তাই আপনি কূফায় হাজির হয়ে আমাদের বায়‘আত গ্রহণ করুন। পত্রের সংখ্যা পাঁচশ’ বা এর অধিক ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য চাচাত ভাই মুসলিম ইবনু ‘আকিল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কূফায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে হানী ইবনু ‘উরওয়ার বাড়ীতে অবস্থান করে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র নামে বিশ হাজারের অধিক মানুষের বায়‘আত নেন। আর হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র নিকট পত্র পাঠান যে, তাঁর নামে বায়‘আত গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কূফায় আগমণ করুন।

এদিকে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিমের পত্র পেয়ে যিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ মক্কা থেকে কূফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ খবর খলীফা ইয়াযীদের নিকট পৌঁছলে বাসরার আমীর উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদকে নির্দেশ করেন যে, তুমি বাসরার সাথে কূফারও দায়িত্ব গ্রহণ কর। অন্য দিকে কূফার আমীর নু‘মান ইবনু বাশীরকে বরখাস্ত করেন। কারণ তিনি মুসলিম ইবনু আকিল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সাহায্য করেন। ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদকে কূফার বিদ্রোহীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। কিন্তু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যার জন্য কোনো প্রকার নির্দেশ দেননি।

এদিকে মুসলিম ইবনু ‘আকীল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চার হাজার মানুষ সঙ্গে করে কূফার গভর্নর হাউসে পৌঁছে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইবনু যিয়াদ টের পেয়ে গেট বন্ধ করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। আর বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদেরকে অর্থের বিনিময়ে মানুষকে মুসলিম ইবনু আকীল থেকে দূর করার জন্য নির্দেশ দেয়। ফলে ভাগতে থাকে একে একে মুনাফিক্বরা অনেকে। শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে মাত্র ৩০ জন। মুসলিম তাদেরকে সঙ্গে করে মাগরিবের সলাত আদায় করেন। অন্ধকার ঘনিভূত হলে অবশিষ্ট মুনাফিক্বরাও পালিয়ে যায়, বাকি থাকেন একা মুসলিম ইবনু আকিল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। শেষ পর্যন্ত তিনি অন্ধকারে অচেনা জায়গায় কি করবেন, কোথায় যাবেন, পড়লেন মহাবিপাকে।

ওদিকে ইবনু যিয়াদ বিভিন্ন গোত্রপতিদের সঙ্গে করে নিয়ে মুসলিমের খোঁজে বের হয় এবং যে মুসলিমকে হত্যা করবে তার কোনো কিসাস (বিচার) নেই বলে ঘোষণা দেয়। আর যে তাকে জীবিত অবস্থায় হাজির করবে তার জন্য ঘোষণা করে বিশেষ পুরস্কার। শেষ পর্যন্ত মুসলিমকে ধরে ফেললে তিনি হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পরিবারের জন্য ভীষণভাবে কাঁদেন। পরিশেষে হত্যার পূর্বে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র উদ্দেশে একটি পত্র লিখেন যে, আপনি স্বপরিবারে ফিরে যান। এখানকার মানুষ খিয়ানত করেছে। কিন্তু কুচক্রদলের লোকেরা পত্র বাহককে পথেই হত্যা করে ফেলে, যাতে করে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখেন। মুসলিমকে হত্যার দিনটি ছিল ‘আরাফাতের দিন। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন পথে জানতে পারেন যে, অবস্থা ঘোলাটে তখন ফিরে আসার চিন্তা করলে মুসলিম ইবনু আকিল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র সন্তানরা বলেন, আমাদের বাবার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ফিরে যাব না। এদিকে ইবনু যিয়াদ পরিস্থিতির মুকাবেলা করার জন্য প্রথমে হুর ইবনু ইয়াযিদ আতুতায়মীর নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। পরে ‘উমার ইবনু সা‘দের নেতৃত্বে আরো চার হাজার সৈন্য পাঠায়। অবস্থা বেগতিক দেখে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন– **১.** আমাকে তোমরা মদীনায় ফিরে যেতে দাও। **২.** অথবা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে দাও। **৩.** আর না হয় শামে (সিরিয়াতে) ইয়াযিদের নিকটে যেতে দাও। কিন্তু ইবনু যিয়াদ কোনো প্রস্তাব না মেনে হুকুম জারি করে যে, আমার নির্দেশ মানতে হবে আর না হয় যুদ্ধ করতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র সঙ্গে ছিল মাত্র ৩০ জন অশ্ববাহিনী, ৪০ জন পদাতিক বাহিনী। আর আহলে বাইতের ছোট ছোট বাচ্চা ও নারীদের ১৭ জন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য হন এবং একে একে মোট ৭২ জন শাহীদ হন। আর নরপশু শিম্মার ইবনু যিল জাওশানের উস্কানিতে পিশাচ খাওলা আল-আসবাহী তাঁর সিনার মধ্যে আঘাত করে এবং মালাউন সিনান ইবনু আনাস আন্ নাখঈ হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করে।

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

مقالة / প্রবন্ধ

নবাব সলিমুল্লাহ ও নারী শিক্ষার বিকাশ

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বাংলার মুসলিম সমাজ শিক্ষা, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল। বিশেষত মুসলিম নারীদের শিক্ষার সুযোগ ছিল সীমিত। এ সময় নবাব সলিমুল্লাহ মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতির উন্নয়ন নারীদের শিক্ষার ওপরও নির্ভরশীল। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় নারী শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হয়।

বাংলার মুসলিম সমাজ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। উপনিবেশিক শাসনামলে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটলেও মুসলিম সমাজ, বিশেষত নারীরা নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কারের কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ মুসলিম সমাজকে হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে দেয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবনতি ও সরকারি চাকুরিতে প্রবেশে সীমাবদ্ধতা মুসলিম সমাজকে শিক্ষা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। উপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদন ও আদমশুমারির তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯০১ সালের দিকে বাংলায় সাক্ষরতার হার সামগ্রিকভাবে খুবই কম ছিল। সেটি ৫/৬ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে মুসলিম নারীদের শিক্ষার হার ছিল অত্যন্ত কম। অনেক এলাকায় তা ১ শতাংশের নীচে ছিল।

* **প্রফেসর ও চেয়ারম্যান,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, **পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এ. ইউ. বি।

নবাব সলিমুল্লাহ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী মূল্যবোধে দারুণভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম এবং মুসলিম সমাজের কল্যাণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি জানতেন যে, 'যারা ঈমান এনেছে এবং যাঁদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা উচ্চতর করবেন। এমনিতরো ধারণায় পুষ্ট নবাব সলিমুল্লাহ সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজকে আধুনিক শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

নবাব সলিমুল্লাহ একজন দুরদর্শী সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, শিক্ষাই মুসলিম সমাজের পশ্চাৎপদতা দূর করার প্রধান হাতিয়ার। তিনি শিক্ষাকে কেবল ব্যক্তিগত উন্নয়নের উপায় হিসেবে নয়; বরং জাতীর অগ্রগতির ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতেন।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করেন। মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসনের উদ্দেশ্যে তিনি মোহমেডান হল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং বিপুল অর্থদান করেন। পরবর্তীকালে তা সলিমুল্লাহ মুসলিম হল নামে পরিচিত হয়। ইয়াতীম শিশুদের লালন-পালনের লক্ষ্যে ১৯০৯ সালে সলিমুল্লাহ ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। সমকালীন সমাজে ইয়াতীমদের দেখভালের জন্য ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। মুসলিম শিক্ষার্থী আবাসন সংকট নিরসনের জন্য বরিশালে গড়ে তোলেন ইসলামিয়া বোর্ডিং। এই প্রতিষ্ঠানের নির্মাণে তিনি আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

১৯০৯ সালের মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে তিনি আধুনিক পাঠক্রমভিত্তিক

মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এর ফলেই পরবর্তীকালে আলিয়া মাদ্‌রাসা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়। আজন্ম শিক্ষানুরাগী নবাব সলিমুল্লাহ শিক্ষা বিস্তারে সকল আন্দোলনের অগ্রনায়ক ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নন, তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীর অন্যতম পুরোধা ছিলেন। পূর্ববঙ্গে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে নবজাগরণের ভিত্তি রচনা করে।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম নারীদের শিক্ষার হার ছিল অত্যন্ত কম। সামাজিক কুসংস্কার, দারিদ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব নারী শিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল। অধিকাংশ পরিবার মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনাগ্রহী ছিল। ফলে মুসলিম নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। তিনি মুসলিম সমাজের নেতৃবৃন্দ ও অভিভাবকদের মধ্যে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ/তেজোদীপ্ত বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

নারী শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিদ্যালয় ও শিক্ষা কার্যক্রমে তিনি আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন প্রদান করেন। তাঁর উৎসাহে মুসলিম সমাজে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি হয়।

নবাব সলিমুল্লাহ মুসলিম নারীদের জন্য এমন শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন যেখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাষা ও সামাজিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ধরনের উদ্যোগ পরিগ্রহণের ফলে নারী শিক্ষার ব্যপ্তি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। নারী শিক্ষার পথে বিদ্যমান বাধাসমূহ চিহ্নিত করে তা অপনোদনের কার্যক্রম হাতে নেন। তিনি সামাজিক বাধা দূর করার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। তার প্রগতিশীল নেতৃত্বে মুসলিম সমাজে শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারমূলক চিন্তার প্রসার ঘটে।

নবাব সলিমুল্লাহের শিক্ষাবিষয়ক মহতী উদ্যোগ মুসলিম নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করে। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে–

- নারী সমাজে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়;
- মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রবনতাবৃদ্ধি পায়। শিক্ষিত মুসলিম নারীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে;
- নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও আত্মনির্ভরতার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং
- পরবর্তীতে নারী শিক্ষা আন্দোলনের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

নবাব সলিমুল্লাহর সময়ে নারী শিক্ষার বিস্তার সীমিত ছিল, তবুও তাঁর উদ্যোগ ছিল যুগান্তকারী। তিনি এমন এক সময়ে নারী শিক্ষার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন যখন সমাজের বৃহৎ অংশ এ বিষয়ে অনাগ্রহী ছিল। তাঁর কল্যাণমূখী কর্মকাণ্ড মুসলিম সমাজে শিক্ষা সংস্কারের ধারাকে শক্তিশালী করে এবং নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে।

নবাব সলিমুল্লাহ বাংলার মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম পথিকৃৎ। নারী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা, সচেতনতা সৃষ্টি এবং শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ মুসলিম নারী শিক্ষার বিকাশে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। বর্তমান বাংলাদেশের নারী শিক্ষার অগ্রযাত্রার ইতিহাসে নবাব সলিমুল্লাহর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ।

أفكار ذات صلة / প্রাসঙ্গিক ভাবনা:

সালাফদের গোপন ‘ইবাদত ও বর্তমানে আমাদের অবস্থা

মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম*

গোপন ‘ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: সালাফগণ প্রকাশ্য ‘ইবাদতের চাইতে গোপন ‘ইবাদতে বেশি মশগুল থাকতেন। দুনিয়ার যাবতীয় মোহ, ভোগ বিলাস, চাহিদা, প্রবঞ্চনা লোভ, লালসা ইত্যাদি সকল কিছু বর্জন করে একমাত্র রবের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একাগ্রচিত্তে একমাত্র মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশা জাগ্রত করে জান্নাতের মেহমান হওয়ার আশায় গোপন ‘ইবাদতকে সম্বল করার সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা করতেন। মূলতঃ পূর্ববর্তী সালাফদের জীবনী আলোকপাত করলে বিষয়টি আমাদের চলার পথে অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং গোপন ‘ইবাদত আসলেই মু’মিনের জীবনে এক মহা অস্ত্র যার দ্বারা বান্দা সকল ধরণের বিপদ ও আপদ থেকে উদ্ধার লাভ করে থাকে। গোপন ‘ইবাদত মানেই মহান রবের ভালোবাসা, প্রেম প্রীতি ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে হৃদয়ে পরমাতৃপ্তি অর্জন করা। সেই ‘ইবাদত হলো বান্দা ও রবের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের এক মহা সেতুবন্ধন। তাই তো পূর্ববর্তী বিদ্বানদের জীবন চরিতে লক্ষ্য করা যায়- তাঁরা পছন্দ করতেন ব্যক্তির এমন কিছু ‘আমল থাকা যা অন্য কেউ তো দূরের কথা তাঁর স্ত্রীও যেন না জানে।[১]

মুসলিম বিন ইয়াসার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: মহান আল্লাহর সাথে নিভৃতে প্রার্থনা করে যে তৃপ্তি অর্জিত হয় তা বিরল অর্জন।[২]

সাহাবী ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: যে ব্যক্তি লোকচক্ষুর সামনে যেভাবে সালাত আদায় করে সেইভাবে যদি লোকচক্ষুর আড়ালে আদায় না করে তাহলে সে আল্লাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করল।[৩]

অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা আন্-নিসা’র ১০৮ নং আয়াত দলিল পেশ করেন।

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদিন তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলেন: তোমরা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সাহাবীদের থেকে বেশি সালাত আদায়কারী এবং অধিক জিহাদকারী অথচ তারাই তোমাদের থেকে উত্তম। সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন, তা কিভাবে? উত্তরে বললেন: তাঁরা অধিক দুনিয়া বিমুখ ও আখিরাত মুখী ছিলেন।[৪]

প্রখ্যাত বিদ্বান ইবনু রজব হাম্বলি (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত “জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম” কিতাবে ওয়াহ্হাব বিন মুনাব্বিহ (রাহিমাহুল্লাহ)’র একটি বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সেটা হলো– “কল্যাণকর গোপন বিষয়ের দ্বারা মহান আল্লাহর আনুগত্যকে নিষ্কলুষ করো। যার বাস্তবতা প্রমাণিত হবে তোমার গোপন ও প্রকাশ্য ‘ইবাদতের মাধ্যমে। একথা কখনও ভেবো না যে, প্রকাশ্য ‘ইবাদত গোপন ‘ইবাদত হতে উত্তম ও সুফলদায়ক। কেননা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ‘ইবাদতের তুলনা হচ্ছে গাছের পাতার সাথে মূলের মতো। প্রকাশ্য ‘ইবাদত পাতার মতো আর গোপন ‘ইবাদত মূলের মতো। যদি গাছের মূলে পচন ধরে তাহলে গাছের ডাল পালা, পত্র, পল্লব, কাণ্ড সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি মূল ঠিক থাকে তাহলে গোটা গাছ ঠিক থাকবে। সুতরাং গাছের বাহ্যিক অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার মূল মাটির নিচে তথা গোপন ও অদৃশ্য থাকবে। গোপনাংশ দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা বান্দার বাহ্যিকাংশকে সত্যায়িত করবেন।[৫]

সালাফদের গোপন ‘ইবাদতের অনুপম দৃষ্টান্ত:

১. মুহাম্মদ বিন ওয়াসে (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমি এমন পুণ্যাত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছি, মহান আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করতে করতে যাঁদের স্বীয় বালিশ ভিজে যেত অথচ

---

* *শিক্ষক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন এন্ড ইসলামিক একাডেমী, সদর দিনাজপুর ও পাঠাগার সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, দিনাজপুর জেলা শাখা।*

[১] *তাহযীবুল কামাল- ১৪/৪৬৪।*

[২] *হিলায়াতুল আউলিয়া- ৪/২৭২।*

[৩] *আল মুজামুল কাবীর- তাবারানী, ৯/১৫৩।*

[৪] *আল মুজামুল কাবীর- তাবারানী, ৯/১৫৩।*

[৫] *জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম- ৭৫।*

একই বালিশে শায়িতা স্ত্রী স্বামীর এ অবস্থা টেরও পেত না। এমন অনেকের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা সালাতের জন্য কাতারে দাঁড়িয়ে কান্না করতেন অথচ তাঁর পাশের ব্যক্তি তা অনুভবও করতে পারত না।[১]

২. প্রখ্যাত বিদ্বান আইয়ুব আস সাখতিয়ানী (রাহিমাহুল্লা-হ) সারা রাত জেগে 'ইবাদত করতেন এবং তা গোপন রাখতেন। যখন ফজরের সময় হত তখন তিনি এমন উঁচু আওয়াজ করতেন যেন মনে হত তিনি এইমাত্র ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন।[২]

৩. ইবনু ইসহাক (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: মদীনাবাসী জীবনোপকরণ লাভ করত কিন্তু তারা টের পেত না যে, কোথা থেকে এই উপকরণ, আসবাবপত্রের আয়োজন ও আগমন ঘটে। অতঃপর যখন 'আলী ইবনু আল হুসাইন ইন্তিকাল করলেন তখন রাতের আঁধারে পাওয়া সেই উপকরণ আসাও বন্ধ হয়ে গেল।[৩]

৪. জায়িদাহ্ হতে বর্ণিত যে, মানসুর ইবনু আল মুতামির ৬০ বছর যাবৎ রাত জেগে 'ইবাদত এবং দিনের বেলা সিয়ামের মাধ্যমে দিন কাটাতেন। তিনি অধিক পরিমাণে কান্না করতেন। এতে তাঁর মা তাঁকে বলতেন: বাবা! তুমি কি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছ নাকি? (বেশি কান্না করার কারণে তাঁর মা এভাবে জিজ্ঞেস করেন)। তিনি উত্তরে বলেন: মা, আমি আমার আত্মার কাজের ওপর অধিক অবগত। যখন সকাল হত তখন তিনি দু'চোখে সুরমা, মাথায় তেল ও দু'ঠোঁট মানুষের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতেন। এগুলো করার কারণ হলো– মানুষ যেন টের না পায় তাঁর গোপন 'ইবাদত সম্পর্কে।[৪]

৫. আবূ শাসা রবিয়াহ ইবনু ইয়াজিদ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: ৪০ বছর ধরে আমি মসজিদে ছিলাম এমতাবস্থায় মুয়াজ্জিন ফজরের আজান দেন শুধুমাত্র সফর অথবা অসুস্থতা ব্যতিত এর ব্যতিক্রম হত না।[৫]

৬. বিখ্যাত তাবেয়ী সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: মুয়াজ্জিন ৩০ বছর ধরে আজান দিয়েছে অথচ এমতাবস্থায় আমি মসজিদে ছিলাম। আমার ৫০ বছর যাবৎ তাকবীরে তাহরিমা ছুটেনি। আর আমি নামাযে মুসল্লির গর্দান দেখিনি (সর্বদা প্রথম কাতারে ছিলাম)।[৬]

৭. হাসসান বিন আবী সিনান সম্পর্কে বলেন: তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে বিছানায় ঘুমাতেন অতঃপর যখন বুঝতেন যে, তাঁর স্ত্রী ঘুমিয়ে গেছে তখন তিনি তাঁকে ফাঁকি দিয়ে উঠতেন যেমন মা তাঁর ছোট্ট শিশুকে ফাঁকি দেয়।[৭]

৮. 'আলী ইবনু মুনকাদির (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: ৪০ বছর যাবৎ সূর্য উদিত হওয়া ছাড়া আমাকে আর অন্য কিছু চিন্তায় ফেলেনি।[৮]

৯. ফুযাইল ইবনু ইয়াজ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: যখন সূর্য অস্ত যায় তখন আমি আনন্দিত হই এইজন্য যে, রাত্রির অন্ধকারে আমি আমার রবের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। আর যখন সূর্য উদিত হয় তখন আমি চিন্তাগ্রস্থ হই।[৯]

বর্তমান সমাজ ও গোপন 'ইবাদত: বর্তমান আলেম সমাজ বলেন কিংবা সাধারণ মানুষের 'ইবাদতের অবস্থার কথা বলেন। প্রায় সকলের মধ্যে 'ইবাদতে শীথিলতা, নিয়তের প্রকাশ্য দূর্বলতা, 'আমল, আখলাকের মারাত্মক দৈন্যতা বিদ্যমান। অন্তরে বিভিন্ন লৌকিকতা, হিংসা, বিদ্বেষ, নিফাকের মতো ব্যাধি জেঁকে বসেছে। ফলে গোপন 'ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করা থেকে শত মাইল বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে আজকের সমাজ ও অধিকাংশ মুসলিম। গোপন 'ইবাদতকে বলা হয় 'ইবাদতের রুহ্ তথা আত্মাস্বরূপ। যার যত 'ইবাদত গোপনীয় থাকবে তাঁর দ্বীনের সৌন্দর্য, আত্মিক উন্নয়ন ও দুনিয়া বিমুখতা অর্জন হবে। কারণ গোপন 'ইবাদত প্রত্যেক বান্দার জন্য ঢালস্বরূপ। যখন বান্দা অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদে পতিত হয় তখন বান্দা এই ঢাল তথা হাতিয়ার দ্বারা মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করার মাধ্যমে বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে। যুগে যুগে আমাদের পূর্বসূরীরা এভাবেই তাঁদের জীবনকে সাজিয়েছেন। দুনিয়ার যত লোভ, লালসা, পদ, পদবি কিংবা তোষামোদ করে উপার্জন করা,

---

[১] *তাহযিবুল কামাল- ২৮/৫৫৪।*
[২] *তাযকিরাতুল হুফফায- ১/১৩১।*
[৩] *আল মাহাজ্জাহ ফি সাইরিদ দুলজাহ- ৫৬।*
[৪] *তাহযিবুল কামাল- ২৮/৫৫৪।*
[৫] *আহাদীসু ওয়া উযাত ফি ফাযলিত তাকবিরি ইলাস সালাত- পৃ. ৮।*
[৬] *ঐ- পৃ. ৮।*
[৭] *কিয়ামুল্লাইল- ডক্টর মুহম্মদ বিন ইব্রাহিম সুলাইমান আর্ রুমী, ১০৩ পৃ.।*
[৮] *এহইয়া উলুমুদদ্বীন- ১/৪২৫।*
[৯] *ঐ।*

মনোতুষ্ঠি অর্জন, শাসকের নৈকট্য লাভসহ সব কিছুর বন্ধন ছিন্ন করে তাঁরা এক মহৎ জীবন গড়ে তুলেন।

এজন্য হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সে মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! এমন লোকদের সান্নিধ্যেও আমি ছিলাম, যারা দুনিয়াকে পায়ের তলার মাটির চেয়েও তুচ্ছ মনে করতেন।[১]

অথচ আমাদের দুনিয়ার প্রতি এত লোভ, লালসা। দুনিয়া পাওয়ার জন্য কত ব্যস্ততা, দৌড়ঝাঁপ আর এদিক ওদিক ছোটাছুটি। গোপন 'ইবাদতে মশগুল না হয়ে যতটুকু 'ইবাদত করা হয় ঠিক সেই 'ইবাদতগুলোর বারাকাহ নষ্ট করা হয় 'ইবাদতে লৌকিকতা প্রদর্শনে। আগের যুগে না হয় মানুষকে 'ইবাদত দেখানোর কিংবা শুনানোর দৃশ্য ছিল স্থানগত স্থীরতার মাধ্যমে অথবা ব্যক্তি বিশেষে বার্তা ছড়ানোর মাধ্যমে। কিন্তু আজকের এই প্রযুক্তির যুগে আপনি আমি যেখানেই থাকি না কেন। আমাদের 'ইবাদত প্রদর্শনের সে মহারোগ এমনভাবে আক্রমণ করেছে যেটা সত্যিই 'ইবাদতে খুলুসিয়াতকে নষ্ট করে। আজকের যুগে 'ইবাদত প্রদর্শনী হচ্ছে বিভিন্ন মাধ্যমে। কেউ নামায আদায়ের ছবি ফেসবুকে ছেড়ে দিচ্ছে, কেউ সিয়ামের, আবার কেউ কেউ হজ্জ আদায় করে কাবার পবিত্র গিলাফ ধরা অবস্থায়ও গোটা বিশ্বকে জানিয়ে দিচ্ছে! কেউ কেউ আবার কুরবানী দেয়ার চিত্রটাও সোসাল মিডিয়ায় প্রকাশের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশা পোষণ করছে। এটাই হলো বাস্তবতা। আবার যারা বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল করেন তাঁরাও এই সস্তা জনপ্রিয়তা, প্রসিদ্ধি লাভ, মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য, লোকের মনযোগ কামনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাব ভঙ্গিমায় কিংবা সুর প্রকাশ করে মাঠ পর্যায়ে বিশাল অবস্থান তৈরি করছে অস্বচ্ছ নিয়তে লৌকিকতার রোগের বশবর্তী হয়ে। মিডিয়ার যুগে এগুলো এমনভাবে চেপে বসেছে– যদি মানুষকে না দেখায় কিংবা না শোনায় তাহলে তো ফিল্ড পাওয়া যাবে না, মানুষের সমাদর পাওয়া যাবে না! এই জন্য আমাদের এই নামায, সিয়াম, হজ্জ, দান-সাদাক্বাহ্ আর দা'ওয়াতী কাজে সকল লৌকিকতায় ভরে যাওয়ায় 'ইবাদতের রুহ্ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে রিয়া তথা লোক দেখানো 'ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে শির্কে পরিণত হয়। হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته و شركه.

"আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে আর ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে তাহলে আমি ঐ অংশীদারকে ও অংশীদারীকে প্রত্যাখ্যান করি।"[২]

একটু লক্ষ্য করুণ! মুহাম্মদ ইবনু ফুজাইল (রাহিমাহুল্লাহ)'র বক্তব্য। তিনি বলেন: গত ৪০ বছর যাবৎ যতটা কদম আমি হেঁটেছি, তার সবটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার জন্য। গত ৪০ বছর যাবৎ মহান আল্লাহর প্রতি লজ্জাবশতঃ কভু নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিনি। গত ৩০ বছর যাবৎ আমার দুই ফেরেশ্তাকে লিখতে হয় এমন কোনো পাপকর্ম আমি করিনি। যদি কখনও অল্প কিছু করেও থাকি, তবুও তাঁদের দু'জনকে লজ্জা পেয়েছি।[৩]

সুবহানআল্লাহ! চিন্তা করেছেন, পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ তাঁদের জীবনের প্রত্যেকটি ধাপকে কিভাবে অতিক্রম করেছেন। তাঁদের জীবনে সকল কার্যক্রমগুলো লৌকিকতা বিমুখ রেখে স্রেফ মহান আল্লাহর জন্য সম্পাদন করে। ফলশ্রুতিতে তাঁরা 'ইবাদতের স্বাদ অনুভব করেছেন এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন। যেখানে দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ নেই, নেই কোনো মানুষের চাহনী, আকর্ষন কিংবা শোনানোর ঢাক ঢোলের আয়োজন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের 'আমলে একনিষ্ঠতা দান করুক এবং দুনিয়া বিমুখ মহৎ জীবন গড়ার তাওফীক্ব দান করুক –আমীন।

[১] *আস সিয়ারু 'আলামিন নুবালা- ৮/৪২৭।*

[২] *মুসলিম- হা. ৭৬৬৬, ৪৬/২৯৮৫; মিশকাত- হা. ৫৩১৫।*

[৩] *সিফাতুস সাফওয়াহ- ৪/১৬৫।*

الحياة المستنيرة / আলোকিত জীবন

বিপ্লবী বীর সেনানী সাইয়্যেদ আহমেদ ব্রেলভী (রাহিমাহুল্লা-হ)

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

মুসলিম ইতিহাসে এমন কয়েকজন বীরদের আগমন ঘটেছিল, যারা পৃথিবীকে মহান আল্লাহর দ্বীনে আলোকিত করার প্রয়াস চালিয়েছিল। নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিল দ্বীন প্রতিষ্ঠার আত্মত্যাগে। তাদের ছিল না তেমন সম্পদ, বাহিনী, শক্তি; বরং ছিল ঈমানীর শক্তির তীব্র সাহসের যাত্রা। এমন এক মুহূর্ত অতিক্রম করেছিল ভারতবর্ষে ১৯ শতকের গোরায়। যিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পথ বা তরিকায়ে মুহাম্মদী নামক এক আন্দোলন শুরু করেন যা ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগের সাহাবায় কেরামদের মতো করে এক আদর্শিক নব জাগরণের ডাক। ভারতবর্ষ থেকে শির্ক-বিদআত উৎখাত করে ইসলামী পূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার মোক্ষম সংগ্রামী বিপ্লবী জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর উপমহাদেশ ছিল মুসলিম ইতিহাসের এক চরম সংকটকাল। রাজনৈতিক ক্ষমতা ভেঙে পড়েছে, ইসলামী শাসনের ভিত্তি দুর্বল, আর সমাজে শির্ক, বিদ'আত ও নৈতিক অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। এই অন্ধকার সময়েই আল্লাহ তা'আলা উম্মাহকে পথ দেখানোর জন্য দাঁড় করান এক আপসহীন মুজাহিদ। তিনি আর কেউ নন, ইতিহাসে হারিয়ে যাওয়া এক বিপ্লবী বীর- সাইয়্যেদ আহমেদ ব্রেলভী (রাহিমাহুল্লা-হ)।

ব্রিটিশ ভারতীয় প্রেক্ষাপট: তৎকালীন ভারতবর্ষ ছিল একদিকে ইংরেজ কবলিত উপনিবেশ ও অন্যদিকে শিখ, মারাঠা ও ফরাসী ইত্যাদি ক্ষুদ্র শাসক শ্রেণির শাসন যা মুসলমানদের ইসলামী চেতনা বিনষ্ট ও তাদের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাতে থাকে। এরূপ উপনিবেশের সবচাইতে প্রভাব ফেলে ইংরেজ শক্তি, যা ধীরে ধীরে মুসলমানদের গ্রাস করেছে। মুসলমানরা তখন নেতৃত্বহীন হয়ে যায়। এমন ভারতবর্ষের এই আবস্থাতে প্রখ্যাত আলেম শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহিমাহুল্লা-হ) (১১১৪-১১৭৬ হি.)'র বিশিষ্ট উত্তরসূরী তৎকালীন বিখ্যাত আলেম শাহ আব্দুল আযিয দেহলভী (রাহিমাহুল্লা-হ) (১১৫৯-১২৩৯ হি.) ভারতকে দারুল হারাব (যুদ্ধ কবলিত এলাকা) ঘোষণা দেয়। তখন এটার ওপর জিহাদ করা ফরজ হয়ে যায়। বীরত্বের মতো এই সংগ্রামী হুংকার দেন, সাইয়্যেদ আহমেদ ব্রেলভী (রাহিমাহুল্লা-হ)।

জন্মকাল: সাইয়্যেদ আহমেদ ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের রায়ব্রেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন, শাহ আলামুল্লাহ। তার পঞ্চম সন্তান- আহমেদ। তাঁর পূর্ব পুরুষ শাইখুল ইসলাম সাইয়্যেদ কুতুবউদ্দিন। একজন সাহসী আলেম ও মুজাহিদ। যিনি গজনী হয়ে ভারতে আসেন ও এলাহাবাদের কারা অঞ্চল দখল করেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

শিক্ষাজীবন: সাইয়্যেদ আহমেদ ৪ বছর বয়সে মক্তবের মাধ্যমে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে পিতাকে হারান ও পরিবারসহ লাখনৌ পাড়ি যমান। সেখানে পৌঁছার পর সহজ ছিল না জীবনটা। দারিদ্রতা ও বেকারত্বের মধ্য দিয়ে জীবন পাড় করেছেন। সাইয়্যেদ সাহেব তখনকার দেশের মানুষদের এরূপ কঠিন মূহুর্তে বাস্তবতাকে সূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি জীবনের লক্ষ্যে দিল্লি যাওয়ার জন্য মনস্থ করলেন।

তখনকার বিখ্যাত আলেম, মুহাদ্দিস শাহ আব্দুল আযিয দেহলভী (রাহিমাহুল্লা-হ) দিল্লিতে ছিলেন। তাঁর এ পদক্ষেপ বিভিন্ন দিক থেকে বাঁধা ও কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তবে এতো কিছু সত্ত্বেও তিনি সব বাঁধা মোকাবেলা করে দিল্লি পৌঁছান। তিনি শাহ আব্দুল আযিয-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠান তার ভাই শাহ আব্দুল কাদিরের কাছে। সেখানে তিনি কুরআন, হাদীস, আরবী ব্যাকরণ, ফিকাহ, 'আক্বীদাহ্ ও যাবতীয় ইসলামী জ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি ফার্সী ভাষায় পাণ্ডিত্য আর্জন করেন। তারপর জ্ঞান অর্জন শেষে ফিরে আসেন - জন্মস্থান রায়ব্রেলীতে।

কর্মজীবন: দিল্লি থেকে ফিরে এসে সাইয়্যেদ সাহেব বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। ছাত্রজীবন থেকে প্রত্যক্ষ করছিল মুসলিম সমাজের দূরাবস্থা। জাতিকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর মনে ছিল সুতীব্র প্রত্যাশা। তিনি দেখেছেন জাতির মধ্যে কাপুরষতা, গোলামী, দালালী, পরনির্ভরতা ও অধঃপতন। তখন তাঁর মনে এই জাতির নবজাগরণের ভাবনা গেঁথে গিয়েছিল। এই নবজাগরণের ভাবনা করে দিয়েছিল এক বিপ্লবের পথ। ১৮১১ সালে তিনি আবার দিল্লি ফিরে গিয়ে শাহ আব্দুল আযিয-এর পরামর্শে নবাব আমির খান (১৭৬৯-১৮৩৪)-এর সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। আমির খান তখন মালুয়া

* মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

ও রাজস্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেছিলেন। সাইয়্যেদ সাহেবের তখন মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল- জিহাদের সঠিক প্রশিক্ষণ ও ইংরেজদের তাড়ানো। সেই আমির খানের বাহিনীতে ছিল ৪০ হাজার সিপাহী ও ১৪০টি তোপ। এই বিশাল বাহিনীতে তিনি ইংরেজদের তাড়ানোর জন্য যোগদান করছিলেন। আমির খান যখন টঙ্ক রাজ্য দখল করলো ও ইংরেজদের সাথে চুক্তি-স্বাক্ষরে সমঝোতা করে নিলেন। তখন সাইয়্যেদ সাহেব এটির কঠোর বিরোধিতা করে সেখান থেকে ফিরে আসেন। অতঃপর দিল্লিতে ফিরে এসে ধর্মীয় দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ করেন। দিল্লির শাহ ওলিউল্লাহ পরিবারের দুই বিশেষ ব্যক্তিত্ব মাওলানা আব্দুল হাই ও মাওলানা শাহ ইসমাঈল তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তাছাড়া বহু আলেম ওলামা মাশায়েখ তাদের সাথে যুক্ত হয়। তিনি দিল্লি, মুজাফফরনগর, সাহারানপুর, রামপুর, রায়ব্রেলী, শাহজানপুরসহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষ একেশ্বরবাদী ও গোঁড়ামী পরিত্যাগ করে সঠিক মুহাম্মাদী দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর দাওয়াতী সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামী চেতনা আবার প্রাণ ফিরে পায়।

সাইয়্যেদ সাহেবের নিজ জন্মস্থান রায়ব্রেলীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি সেখানে ফিরে আসেন ও সমাজের কাজে নিয়োজিত হোন। তাঁর দাওয়াতী কাজ তখন তিনি বেমারস, কানপুর, সুলতানপুর ইত্যাদি অঞ্চলে। তাঁর কাছে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এসে বায়আত গ্রহণ করতো।

এরপর তিনি লাখনৌতে গিয়ে শাহ ইসমাঈল, আব্দুল হাই ও শতাধিক মানুষদের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। তাঁর এই দাওয়াতে লোকেরা শির্ক-বিদআত থেকে ফিরে আসতে শুরু করলো। তিনি লোকজনদের নিয়ে গড়লেন এক সশস্ত্র বাহিনী।

হজ্জ পালনঃ তৎকালীন ভ্রান্ত কিছু আলেম সমাজ ফাতাওয়া দেন, জাহাজ পথে হজ্জ পালন করা যাবে না ও ভারতের মানুষদের জন্য হজ্জ পালন করা ফরজ নয়। এই ফাতাওয়াকে তীব্র প্রতিবাদ করে ১৮২১ খ্রি. রওনা হোন হজ্জ পালন করার উদ্দেশ্য। তাঁর সাথে ছিল ৪০০জন মুসলিম মুজাহিদ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হজ্জ পালন এবং পথে পথে দাওয়াত ও মানুষদের মধ্যে ঈমানী চেতনা জাগানো। তিনি পথে দাওয়াতী কাজ করতেন ও হাজার হাজার মানুষ তাঁর হাতে বায়াআত গ্রহণ করতো। তিনি তখনকার ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় গিয়েও দাওয়াতী কাজ করেন। সেখান থেকে তাঁর সাথে ৭৭৫ জনের এক বাহিনী নিয়ে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি ১৮২২ খ্রি. ১৬ মে জেদ্দায় পৌঁছান। তিনি প্রথম বছর হজ্জ পালন করেন ও সেখানে আরোও একটি বছর অতিবাহিত করেন। তিনি সেখানে বহু জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করেন। তারপর দ্বিতীয়বার হজ্জ পালন শেষে ১৮২৪ সালে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

সংগ্রামী জীবনঃ সাইয়্যেদ সাহেব কেবল একজন আলেম বা সংস্কারক নন; বরং তাওহীদী আদর্শে দীপ্ত এক বিপ্লবী নেতা ছিলেন, যিনি কলমের পাশাপাশি তরবারিকেও ব্যবহার করেছেন দ্বীনের পুনর্জাগরণের জন্য। তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক আন্দোলনের ভিত্তিতে তাঁর সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত ঘটে। সাইয়্যেদ আহমদ ব্রেলভী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রথমে সমাজ সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি দেখলেন, মুসলিম সমাজ কবরপূজা, পীরবাদ, তাবিজ-কবচ ও নানা বিদ'আতে জর্জরিত। তাই তিনি শুরু করেন তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক দাওয়াতী আন্দোলন। তাঁর আহ্বান ছিল স্পষ্ট, "ইসলামের বিজয় ফিরিয়ে আনতে হলে আগে 'আক্বীদাহ্ সংশোধন করতে হবে।"

এই দাওয়াত অল্প সময়ের মধ্যেই তরুণ আলেম ও মুজাহিদদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এই সময়ে তিনি ভারতে স্বল্প মুসলিমদের সংগঠিত করে চললেন জিহাদের পথে। পথটা অনেক কঠিন ও চ্যালেঞ্জের, কিন্তু মনে ছিল অদম্য আগ্রহ, সাহস ও উদ্দীপনা। তখনকার পাঞ্জাবের মুসলমানরা ছিল চরম ক্ষতির মধ্যে। ইসলামী ভূমি স্বাধীন করা ও সত্যের ডাকের মাধ্যমে ইসলামকে পূর্ণজাগরণ করা। কুরআন ও হাদীসের মহান বাণীর মাধ্যমে তিনি শুরু করেন বিপ্লবীদের পথ, মুজাহিদদের পথ। পাঞ্জাবের সংখ্যারিষ্ঠ মুসলমানরা তখন শোসিত ছিলেন। সেখানকার মুসলমানরা ছিল নির্যাতিত, নিপীড়নে শিকার। সামরিক প্রশিক্ষণ ও রাজনৈতিকভাবে তার ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে তিনি এই অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিল। শুধু দাওয়াতেই থেমে থাকেননি তিনি। তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে (বর্তমান খাইবার-পাখতুনখোয়া অঞ্চল) শিখ শাসক রঞ্জিত সিং মুসলমানদের ওপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছিল। মসজিদ ভাঙা, আযান বন্ধ, শরীয়াহ চর্চায় নিষেধাজ্ঞা –সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। এই অবস্থায় সাইয়্যেদ আহমদ ব্রেলভী (রাহিমাহুল্লাহ) ঘোষণা করেন, "যেখানে দ্বীন নিরাপদ নয়, সেখানে জিহাদ ফরজ।" তিনি হাজার হাজার মুজাহিদ সংগঠিত করেন এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হিজরত ও জিহাদ আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানরা প্রথমবারের মতো শিখ শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

قصص الحديث / ক্বাসাসুল হাদীস

জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র উটের ঘটনা

আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি নবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমার উটটি অত্যন্ত ধীরে চলছিল; বরং চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় নবী (ﷺ) আমার কাছে এলেন এবং বললেন, জাবির?

আমি বললাম, জ্বী।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কী?

আমি বললাম, আমার উট আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ধীরে চলছে এবং অক্ষম হয়ে পড়ছে। ফলে আমি পিছনে পড়ে গেছি। তখন তিনি নেমে চাবুক দিয়ে উটটিকে আঘাত করতে লাগলেন।

তারপর বললেন, এবার আরোহণ করো।

আমি আরোহণ করলাম। এরপর অবশ্য আমি উটটিকে এমন পেলাম যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে অগ্রসর হওয়ায় বাধা দিতে হয়েছিল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, কুমারী না বিবাহিতা?

আমি বললাম, বিবাহিতা।

তিনি বললেন, তরুণী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সাথে হাসি-তামাসা এবং সে তোমার সাথে পূর্ণভাবে হাঁসি-তামাসা করত।

আমি বললাম, আমার কয়েকটি বোন রয়েছে, ফলে আমি এমন এক মহিলাকে বিবাহ করতে পছন্দ করলাম, যে তাদেরকে মিল-মহববতে রাখতে, তাদের পরিচর্যা করতে এবং তাদের ওপর উত্তমরূপে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয়।

তিনি বললেন, শোনো! তুমি তো বাড়ীতে পৌঁছবে? যখন তুমি পৌঁছবে তখন তুমি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে।

তিনি বললেন, তোমার উটটি বিক্রি করবে?

আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তা এক উকীয়ার বিনিময়ে আমার নিকট হতে কিনে নিলেন।

তারপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমার আগে (মদীনায়) পৌঁছলেন এবং আমি (পরের দিন) ভোরে পৌঁছলাম। আমি মসজিদে নাববীতে গিয়ে তাঁকে দরজার সামনে পেলাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখন এলে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তোমার উটটি রাখো এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু’রাক‘আত সালাত আদায় করো। আমি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলাম।

তারপর তিনি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে উকীয়া ওজন করে আমাকে দিতে বললেন। বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ওজন করে দিলেন এবং আমার পক্ষে ঝুঁকিয়ে দিলেন। আমি রওয়ানা হলাম। যখন আমি পিছনে ফিরেছি তখন তিনি বললেন, জাবিরকে আমার কাছে ডাকো। আমি ভাবলাম, এখন হয়তো উটটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর আমার নিকট এর চেয়ে অপছন্দনীয় আর কিছুই ছিল না।

তিনি বললেন, তোমার উটটি নিয়ে যাও এবং তার দামও তোমার।[৭৭]

হাদীসের শিক্ষা

০১. দাম-দর করে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়।

০২. নির্দিষ্ট দামে ক্রয় করার পর বিক্রেতাকে বেশি দেওয়া দোষের কিছু নয়।

০৩. নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্য ভাইকে কিছু দেওয়া। যেমন- জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় উটটি রাসূল (ﷺ)-কে দিতে চেয়েছিলেন।

[৭৭] *বুখারী- ২০৯৭।*

الأحداث الجارية / সাময়িক প্রসঙ্গ

অনিশ্চিত ঘরে ফেরা

মো. খশিউর রহমান বিন মো. মুনসুর আলী*

এখন ঘর থেকে বের হওয়া মানেই যেন অনিশ্চয়তার দিকে এক নীরব যাত্রা। কে জানে, এই বের হওয়াই শেষ বের হওয়া কি না! ফিরে আসতে পারবো কি-না, এই প্রশ্নটা যেন অদৃশ্যভাবে প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে লেগে থাকে। একটি ফোনকল, একটি ছোট্ট খবর, আর তাতেই ভেঙে পড়ে একটি পরিবার, নিভে যায় একটি ঘরের আলো। যে মানুষটি সকালবেলা হাসিমুখে বের হয়েছিল, সন্ধ্যায় তারই নিথর দেহ ফিরে আসে, কখনো কফিনে, কখনো অ্যাম্বুলেন্সে, আবার কখনো আর ফিরেই আসে না।

কত পরিবার আছে, যেখানে সেই মানুষটিই ছিল একমাত্র উপার্জনকারী, তার কাঁধেই ছিল পুরো সংসারের ভার। তার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু একজন মানুষ হারায় না, হারিয়ে যায় একটি পরিবারের স্বপ্ন, ভেঙে পড়ে ভবিষ্যতের সমস্ত পরিকল্পনা। ছোট ছোট সন্তানেরা হারায় তাদের আশ্রয়, বৃদ্ধ মা-বাবা হারায় তাদের ভরসা। এক মুহূর্তেই সবকিছু থেমে যায়, হাসি থেমে যায়, চুলা নিভে যায়, জীবন হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ ও অন্ধকারময়।

বিগত দিনগুলোতে পত্রিকার পাতাগুলো যেন শোকের কালো অক্ষরে ভরে উঠেছে। দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে অন্তত ২০৭ জন মানুষের। কিন্তু আমরা সবাই জানি, সংখ্যাটা এখানেই থেমে নেই। পত্রিকার পাতায় যে সংখ্যা উঠে আসে, তার বাইরেও রয়েছে অসংখ্য নামহীন মৃত্যু, অগণিত অজানা গল্প, যাদের কান্না কেউ শোনে না, যাদের ব্যথা কেউ লিখে না।

আরো এমন অনেক দূর্ঘটনা আছে যে দুর্ঘটনাতে নিখোঁজ রয়েছে অনেক প্রাণ, কোথায় তারা, কেমন আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না– কেউ জানে না। তাদের পরিবারের প্রতিটি মুহূর্ত কেটে যাচ্ছে দুঃসহ অপেক্ষায়, অনিশ্চয়তার দহন নিয়ে। প্রতিটি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে বুক কেঁপে ওঠে, এই বুঝি কোনো খবর এলো! কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই সেই অপেক্ষা রয়ে যায় শূন্যতায়।

একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশেও কখনো কখনো এত মানুষের মৃত্যু একসঙ্গে ঘটে না। অথচ আমাদের দেশে কোনো যুদ্ধ নেই– তবুও প্রতিদিন আমরা হারাচ্ছি আমাদের আপনজনদের। সড়ক দুর্ঘটনা যেন আমাদের নীরব যুদ্ধ, যেখানে নেই কোনো সাইরেন, নেই কোনো যুদ্ধঘোষণা, কিন্তু প্রতিদিন লাশের মিছিল বাড়ছে। প্রতিদিন কেউ না কেউ হেরে যাচ্ছে এই অদৃশ্য যুদ্ধে।

নিহত পরিবারকে কিছু টাকা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়।

যে মানুষটি প্রতিদিন আয় করে পরিবার চালাত তার অনুপস্থিতিতে এই সামান্য অর্থ কতদিনই বা চলবে?

যে মানুষটি দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে গেল, তার চিকিৎসা আর জীবনের সংগ্রাম কি এতটুকু টাকায় মিটবে?

একটি শিশুর বাবাহারা হওয়া, বা এক মায়ের একমাত্র সন্তান হারানো, এসব বেদনার কি কোনো মূল্য নির্ধারণ করা যায়?

এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি মানুষের জীবন এতটাই সস্তা হয়ে গেছে?

মানুষের জীবন কি তবে এভাবে টাকার অঙ্কে কেনাবেচা করা যায়?

এ যেন শুধু কিছু অর্থের ঘোষণা নয়, এ যেন আমাদের অসহায়তার এক নীরব স্বীকারোক্তি, যেখানে একটি জীবনের প্রকৃত মূল্য কোনো সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

প্রতিদিন এত শোক, এত কান্না, এত লাশ, সবকিছু দেখতে দেখতে আমাদের হৃদয় যেন ধীরে ধীরে অনুভূতিহীন হয়ে পড়ছে। আগে যেখানে একটি মৃত্যু আমাদের কাঁদাতো, এখন শত মৃত্যুর খবরও আমাদের ভেতরকে তেমন নাড়িয়ে দিতে পারে না। আমরা যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছি লাশের সংখ্যা শুনতে, দুর্ঘটনার খবর জানতে, শোকের গল্প পড়তে।

সত্যিই, আমরা যেন সেই অবস্থায় পৌঁছে গেছি, "অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর"

এ এক ভয়াবহ সময়, যেখানে মানুষ বেঁচে আছে, কিন্তু নিরাপদ নয়; চলাফেরা করছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত নয়;

হাসছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয় নিয়ে বেঁচে আছে।

* মুতাদার্রিব, মাদ্‌রাসা দারুত তাওহীদ, ঢাকা।

এ এক নির্মম বাস্তবতা, যেখানে আমরা জীবনের পথে চলছি, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর ছায়া আমাদের পিছু নিয়েছে।

এই ভয়াবহ বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা শুধু শোক প্রকাশ করে থেমে থাকতে পারি না। প্রতিদিন এত প্রাণ ঝরে পড়ছে, এত পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, এগুলো আর শুধুই দুর্ঘটনা নয়; বরং একটি চলমান জাতীয় সংকট। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাই এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কিছু দাবি ও প্রত্যাশা:

১) কঠোর সড়ক নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন: বেপরোয়া চালনা, লাইসেন্সবিহীন চালক ও ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

২) চালকদের প্রশিক্ষণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা: পেশাদার চালকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত তদারকি চালু করা।

৩) মানবিক ও বাস্তবসম্মত ক্ষতিপূরণ: নিহত ও আহতদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত ও সম্মানজনক সহায়তা নিশ্চিত করা।

৪) নিরাপদ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন: রাস্তা, সিগন্যাল ব্যবস্থা, ফুটওভারব্রিজ ও ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।

৫) দ্রুত উদ্ধার ও চিকিৎসা ব্যবস্থা: দুর্ঘটনার পরপরই জরুরি সেবা ও উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

সংক্ষেপে বলতে চাই, আমাদের দাবি একটাই, মানুষের জীবনের মূল্য যেন কাগজের অঙ্কে সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের নিরাপদে ঘরে ফেরার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা হোক।

সবশেষে আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করি,

হে আল্লাহ! আমাদের দেশ ও সড়কগুলোকে নিরাপদ করুন, সকল দুর্ঘটনা থেকে আমাদের হিফাজত করুন। যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের ক্ষমা করুন, আহতদের পূর্ণ শিফা দিন। রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাওফীক্ব দিন, যেন মানুষ নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারে –আমীন।

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লা-হ) মডেল মাদ্‌রাসা

(বাইপাইল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী "আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লা-হ) মডেল মাদ্‌রাসা", বালক শাখা ও "উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) মহিলা মডেল মাদ্‌রাসা, উভয় শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদে কিছু সংখ্যক দক্ষ লোক নিয়োগ দেওয়া হবে।

ক্র. নং-	পদসমূহ	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	বেতন
১.	অফিস সহকারী কাম হিসাবরক্ষক	০১	স্নাতক অনার্স/সমমান	মাদরাসার সাথে হিসাব রক্ষক হিসাবে দুই বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন	মাদরাসার পে স্কেল অনুযায়ী
২.	বাবুর্চি	০১		মাদরাসায় ৩০০+ ছাত্রের ৩ বেলা রান্নার অভিজ্ঞতা	

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদের কপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, অভিজ্ঞতার সনদ (যদি থাকে)-সহ যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

যোগাযোগ:

সভাপতি/সেক্রেটারি/অধ্যক্ষ
আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী
(রাহিমাহুল্লা-হ) মডেল মাদ্‌রাসা (বাইপাইল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা)

০১৭৬১৮৯৭৭৬ (সভাপতি), ০১৯৪৪৪৬০২২৪ (সেক্রেটারি), **০১৭১২৯৬৮৩০৩ (অধ্যক্ষ)**
হোয়াটসঅ্যাপ ০১৭১২৯৬৮৩০৩

ই-মেইল: akq.modelmadrasah@gmail.com

أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

নওমুসলিম পুনর্বাসন ও কল্যাণে জমঈয়তের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গাজীপুর, ৬ জুন-২০২৬ঃ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দুস্থ ও অসহায় নওমুসলিম পুনর্বাসন কেন্দ্রে গাজীপুর মহানগর জমঈয়তের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি এবং গাজীপুর মহানগর জমঈয়তের সভাপতি ড. মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম মাদানী এবং ইয়াতীম ও দুস্থ-মুসলিম বিষয়ক সেক্রেটারি মাওলানা রায়হান উদ্দীন।

আলোচনা সভায় নওমুসলিম ভাই-বোনদের পুনর্বাসন, দাওয়াতি কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি, মানবিক সহায়তা সম্প্রসারণ এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

বক্তারা বলেন, নওমুসলিমদের ঈমানি দৃঢ়তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাবলম্বী জীবন গঠনে সমন্বিত পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস বিভিন্ন কল্যাণমূলক ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

রাজশাহীতে জমঈয়তের সুধী সমাবেশ ও নতুন শাখা কমিটি গঠন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে আরো গতিশীল ও সুসংহত করার লক্ষ্যে রাজশাহীতে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ জুন শুক্রবার মাগরিবের সালাতের পর রাজশাহী মহানগরীর ডাঁশমারী উত্তরপাড়া আবূ বকর সিদ্দীক আহলে হাদীস জামে মসজিদে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ।

মো. আব্দুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাওলানা হাফেয রমজান আলী, মাওলানা ইমরান আলী এবং সানাউল্লাহ জাকীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা, দ্বীনি শিক্ষা ও দাওয়াতি কার্যক্রম সম্প্রসারণ, সামাজিক কল্যাণমূলক উদ্যোগ বৃদ্ধি এবং ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক জনসচেতনতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি তাঁরা সংগঠনের কার্যক্রমকে আরো কার্যকরভাবে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

সমাবেশে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সমাজসেবী, আলেম-উলামা এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শুভানুধ্যায়ীরা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত অতিথিদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর ও প্রাণবন্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ডাঁশমারী উত্তরপাড়া শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটিতে মো. আব্দুল ওয়াদুদকে সভাপতি, মো. সানাউল্লাহ ও হাবিবুর রহমানকে সহ-সভাপতি এবং মো. আনোয়ারুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং দ্বীনি ও সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তের দিনব্যাপী সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ

গত ৪ জুন-২০২৬, বৃহস্পতিবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা মডেল মসজিদ মিলনায়তনে সকাল ৮টা হতে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত "সংগঠনের গতিশীলতায় আরাফাত পত্রিকা ও তর্জুমানুল হাদীস-এর ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়সমূহ– ১. সংগঠন, ২. গতিশীল, ৩. আরাফাত পত্রিকা ও তর্জুমানুল হাদীস, ৪. ভূমিকা।

১. সংগঠন: সম + গঠন = সংগঠন, সম বলতে জমঈয়তে আল হাদীস মনা এবং গঠন বলতে এক হয়ে থাকা।

নাম: বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস শাখা, এলাকা, জেলা, মহানগর এবং কেন্দ্র। এই সংগঠনে সংগঠিত থাকলে সচেতনতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। নচেৎ আহলে হাদীসের মানহাজ, 'আক্বীদাহ্ হারিয়ে যাবে। ফিৎনা দখলে নিবে সব।

২. গতিশীলতা: নিরবতা পালন, একা একা ভালো থাকা ইমানী মজবুতই বুঝায় না। সংগঠনকে গতিশীল রাখতে হলে পারস্পারিক সম্পর্ক রাখা, মতবিনিময় করা, দাওয়াতী কাজ করা, জ্ঞান অর্জন করা এবং উর্ধ্বতনদের পরামর্শ ও নির্দেশনা পালন করা। প্রত্যেহ সাংগঠনিক কাজে কমপক্ষে ১ ঘন্টা সময় দান করা। আর্থিক কুরবানীতে কৃপণতা না করা, মেহমানদারী করা, হাসিমুখে কথা বলা, নির্লোভ হওয়া, হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করা, আনুগত্যশীল হওয়া। নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, আমানতের খিয়ানত না করা। এই সবের মাঝে সংগঠন অবশ্যই অবশ্যই গতিশীল হবে ইন্ শা-আল্লাহ।

৩. আমাদের মুখপাত্র হচ্ছে– (ক) সাপ্তাহিক আরাফাত এবং **(খ)** মাসিক তর্জুমানুল হাদীস। এই দু'টি মুখপাত্র বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের যোগসূত্র এবং দাওয়াতী কাজের মোক্ষম হাতিয়ার। পত্রিকা হচ্ছে সমাজের দর্পন। এই দর্পনে ফুটে উঠে আমাদের নানাবিধ প্রতিবিম্ব। তাই এই দুই পত্রিকার জন্ম।

(ক) মাসিক তর্জুমানুল হাদীস: ভারত থেকে ১৯৪৯ খ্রি. ২৭ মে পাবনা জেলায় স্থানান্তরিত হয় নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীসের অফিস। প্রতিষ্ঠিত হয় আহলে হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস। প্রকাশিত হয় **মাসিক তর্জুমানুল হাদীস** পত্রিকা। জমঈয়তের অনুসারীদের ভিতরে তর্জুমানুল হাদীস প্রকাশের পর বেশ সাড়া পড়ে যায়। শুরু হয় সংগঠনের গতিশীলতা। বেশির ভাগই হাদীস নিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে তর্জুমানুল হাদীস।

(খ) সাপ্তাহিক আরাফাত: মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকা মাসিক হওয়ায় ৩০ দিনের ব্যবধানে জমঈয়ত প্রেমিকদের জ্ঞানের পিপাসা মিটে না; বরং আরো বেড়ে যায়। তাই ১৯৫৭ খ্রি. ৭ অক্টোবর মুসলিম সংস্কৃতির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বররূপে সাপ্তাহিক আরাফাত-এর আত্ম প্রকাশ হয়। এর মাধ্যমে জমঈয়ত ভূবণে আরো একটি নক্ষেত্রের বহিঃপ্রকাশ। সেই থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দৈনিক পত্রিকার আকারে প্রকাশ হতে থাকে। পরবর্তীতে টেবলয়েট সাইজে প্রকাশ পায়। কিংবদন্তীর মহানায়ক, জ্ঞান তাপস, সর্বোত্তম সংস্কারক, বিশ্বনন্দিত বলিষ্ঠ রাহাবার আল্লামা প্রফেসর ড. আব্দুল বারী স্যারকে তাঁর লাইব্রেরির ভিতরে দেখতে পায়। স্যারকে বলি যে, আরাফাত পত্রিকা মাসিক মদীনার মতো করা যায়কি না। শ্রদ্ধেয় স্যার বললেন, দু'আ করো বেটা, নিজের জায়গায় যখন নিজস্ব প্রেস হবে তখন আমরা করতে পারব ইন্ শা-আল্লাহ। মহান আল্লাহর রহমতে স্যারের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এখন আরাফাত পত্রিকা বর্তমান সাইজে চলমান, বহনযোগ্য এবং সংরক্ষণে সহজ।

প্রশ্নপত্রের উত্তরসহ সম্পাদকীয়, কুরআনের বাণী, তথ্য সূত্রসহ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ স্বাস্থ্য টিপস, যেন একটি অমৃত সূধা। পত্রিকা পড়লে সূধা না পড়লে মাহাকাল!

৪. ভূমিকা: আমাদের প্রকাশিত দু'টি মুখপত্র বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসকে শক্তিশালী করার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রেখে আসছে। শুধু আমরাই অন্ধকারে তাই আসুন! সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকা পড়ি, জীবন গড়ি এবং জমঈয়তকে গতিশীল করি।

কালনী নোয়াগাঁও এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা ও কুরবানী শীর্ষক আলোচনা

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস এর অন্তর্গত কালনী নোয়াগাঁও এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২১ মে বাদ মাগরীব কালনী মধ্য পাড়া জামে মসজিদে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জামি আহ দারুল ইহসান মাদ্‌রাসা খাইলসা-এর ছাত্র হা. আরাফাত। এতে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত থাকেন শাইখ আধ্যাপক আরমানুদ্দিন, সভাপতি, কালনী নোয়াগাঁও এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস। প্রধান অতিথি জনাব গাজী মামুনুর রশীদ, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক, নরসিংদী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস, আলোচক হিসাবে আলোচনা পেশ করেন শাইখ আ. নূর মাদানী, সহ-ফাতাওয়াহ ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ হাফেজ জুলফিকার আলী, দাওয়াহ ও তাবলীগ বিষয়ক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ আনিসুর রহমান, সেক্রেটারি, কালনী নোয়াগাঁও এলাকা শুব্বান। উপস্থাপনায়, রমজান মিয়া, সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান।

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস এর কুরবানী শীর্ষক আলোচনা সভা

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদোগে ভোলাব এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস এর চারিতালুক মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদে, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি শাইখ মাওলানা নূরুল আলম সাহেব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয় এতে আলোচনা পেশ করেন শাইখ মুহাম্মদ মাসউদুল আলম উমরী, সহ-সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস, শাইখ ইকবাল হাসান, সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ হাফেজ জুলফিকার আলী, দাওয়া ও তাবলীগ বিষয়ক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস, শাইখ নজরুল ইসলাম রাজ, তালিম ও তারবিয়াত বিষয়ক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ খলিলুল্লাহ মোল্লা, সদস্য, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। উপস্থাপনায় ছিলেন শাইখ আবুল হোসেন, সহকারী সেক্রেটারি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস।

পাতিরা-ডুমনী এলাকার মস্তুল শাখা জমঈয়তের আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা মহানগর উত্তর পাতিরা-ডুমনী এলাকার মস্তুল শাখা জমঈয়তের উদ্যোগে এক আলোচনা ও মতবিনিময় সভা ২২ মে অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার বাদ মাগরিব মস্তুল হাফিজনগর মসজিদে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মিডিয়া ও জনসংযোগ বিভাগের সেক্রেটারি এবং ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহাম্মদ গোলাম রহমান।

প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের শুব্বান বিভাগের সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহ আল ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের অফিস সেক্রেটারি মোহাম্মদ মোহেবুল্লাহ এবং কেন্দ্রীয় শুব্বানের যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক শাইখ আশিক বিন আশরাফ।

সভায় বক্তারা দ্বীনি দাওয়াহ, সমাজ সংস্কার, যুবসমাজকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে আরো শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পাতিরা-ডুমনী এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মাদ মুখলেসুর রহমান।

দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শুভানুধ্যায়ী, ঢাকার মোহাম্মদপুরের অধিবাসী ড. শারফুল আনাম অসুস্থতাজনিত কারণে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

উল্লেখ্য, তিনি পরলোকগত জমঈয়ত সভাপতি প্রফেসর আল্লামা ড. এম. এ. বারী (রহিমাহুল্লাহ)'র নিকটাত্মীয়।

তাঁর দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ সুস্থতা কামনা করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করার জন্য সকল মুসলিম ভাই-বোনের প্রতি আন্তরিক অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিফায়ে কামিলা ও আজিলা দান করুন –আমীন।

মৃত্যু সংবাদ

০১. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক পার্লামেন্টারিয়ান আলহাজ্জ এ কে এম রহমাত উল্লাহ দীর্ঘদিন অসুস্থতার পর (৩ জুন, বুধবার, ভোর ৪টায়) এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মাইয়্যেতের জানাযা বিকেল চার ঘটিকায় নিজ গ্রাম বেরাইদে অনুষ্ঠিত হয়।

০২. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উপদেষ্টা ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক গত ৬ জুন, শনিবার, বিকাল ৪ ঘটিকায়, রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মাইয়্যেতের জানাযা বাদ 'ইশা, চাষাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে উভয় মাইয়িতের জন্য দু'আ- আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন -আমীন। সকলের কাছে দু'আর অনুরোধ রইল।

التوعية الصحية / স্বাস্থ্য সচেতনতা

তাপপ্রবাহের আগুনে জনস্বাস্থ্য: গরম এখন নীরব ঘাতক

গরম একসময় ছিল ঋতুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এখন সেই গরমই ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে এক নীরব জনস্বাস্থ্য সংকটে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে, আর তার সঙ্গে বাড়ছে তাপপ্রবাহের তীব্রতা ও বিস্তৃতি। ফলে প্রতিদিনের জীবনে অস্বস্তির সীমা ছাড়িয়ে গরম এখন হয়ে উঠছে জীবনহানির ঝুঁকি।

বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যানও সেই আশঙ্কাকেই জোরালো করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক মানুষ তাপজনিত কারণে প্রাণ হারাচ্ছে। বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে এই ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি, যা গত দুই দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিষয়টি আর উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

শরীরের ভেতরে অদৃশ্য লড়াই: মানবদেহ স্বাভাবিকভাবে ঘাম ও রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে নিজের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যখন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা একসঙ্গে বেড়ে যায়, তখন এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ভেঙে পড়ে। ঘাম ঠিকমতো শুকাতে না পারায় শরীরের ভেতরে তাপ জমতে থাকে। এর ফলে মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড ও কিডনির ওপর পড়ে মারাত্মক চাপ। চিকিৎসকদের মতে, অতিরিক্ত গরমে ডিহাইড্রেশন, রক্তচাপ কমে যাওয়া এবং আকস্মিক কিডনি জটিলতার ঝুঁকি বেড়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে তা প্রাণঘাতীও হতে পারে।

গরমজনিত অসুস্থতা: সতর্ক সংকেতগুলো কী বলছে

তাপপ্রবাহের সময় শরীর নানা ধরনের সংকেত দেয়, যা অনেক সময় আমরা অবহেলা করি। সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা হলো হিট স্ট্রোক। এতে শরীরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে উঠে যায় এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা না পেলে মৃত্যুঝুঁকি তৈরি হয়।

এর আগে সাধারণত দেখা দেয় হিট এক্সহস্টশন বা অতিরিক্ত গরমে ক্লান্তি। এ অবস্থায় শরীর অতিরিক্ত ঘামের মাধ্যমে পানি ও লবণ হারায়, ফলে দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, অতিরিক্ত ঘাম, বমিভাব এবং অস্বস্তি দেখা দেয়। অনেক সময় রক্তচাপ কমে গিয়ে ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারেন।

একই সঙ্গে পেশির ক্র্যাম্প বা হিট ক্র্যাম্পও হতে পারে, যা মূলত শরীরের লবণের ঘাটতির কারণে ঘটে। এতে হাত-পা বা পেটের পেশিতে হঠাৎ টান ও ব্যথা অনুভূত হয়। যারা দীর্ঘ সময় রোদে বা গরম পরিবেশে কাজ করেন, তাদের মধ্যে এ সমস্যা বেশি দেখা যায়।

চিকিৎসকরা সতর্ক করছেন, এসব লক্ষণ অবহেলা করলে তা দ্রুত হিট স্ট্রোকে রূপ নিতে পারে।

গরম বাড়ায় আরো নানা রোগের ঝুঁকি: অতিরিক্ত গরম শুধু সরাসরি শারীরিক অসুস্থতাই সৃষ্টি করে না; বরং বিভিন্ন সংক্রামক রোগের ঝুঁকিও বাড়ায়। গরমে পানি সহজে দূষিত হয়, ফলে ডায়রিয়া ও টাইফয়েডের মতো রোগ ছড়ায়। একই সঙ্গে মশার বংশবিস্তার বেড়ে যাওয়ায় ডেঙ্গুর প্রকোপও বাড়ে। এছাড়া তীব্র গরম মানসিক চাপ বাড়ায় এবং শ্বাসকষ্ট বা অ্যাজমার রোগীদের অবস্থাও আরো খারাপ করে তোলে।

কারা বেশি ঝুঁকিতে: সব মানুষ সমানভাবে গরমের প্রভাবের শিকার না হলেও কিছু মানুষ বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি, যারা বাইরে কাজ করেন এমন শ্রমজীবী মানুষ এবং হৃদরোগ, ডায়াবেটিস বা কিডনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এই তালিকায় রয়েছেন। নিম্ন আয়ের মানুষেরাও পর্যাপ্ত ঠাণ্ডা পরিবেশের অভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

ভবিষ্যতের আশঙ্কা: বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ভবিষ্যতে তাপপ্রবাহের তীব্রতা আরো বাড়বে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো, বিশেষ করে বাংলাদেশ, এই ঝুঁকির দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফলে এখনই কার্যকর উদ্যোগ না নিলে এটি দীর্ঘমেয়াদি জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ে রূপ নিতে পারে।

প্রতিরোধই সেরা উপায়: তবে আশার কথা হলো– অধিকাংশ তাপজনিত অসুস্থতা প্রতিরোধ করা সম্ভব। এর জন্য দরকার কিছু সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস।

প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করা, দিনের সবচেয়ে গরম সময়– দুপুর ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত রোদ এড়িয়ে চলা, হালকা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরা এবং নিয়মিত বিশ্রাম নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে নিরাপদ পানি পান ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণের বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে।

পরিবার পর্যায়ে কিছু প্রস্তুতিও গুরুত্বপূর্ণ। ওআরএস, থার্মোমিটার, প্রাথমিক ওষুধ এবং বিশুদ্ধ পানির সংরক্ষণ জরুরি সময়ে বড় সহায়ক হতে পারে।

কখন সতর্ক হবেন: শরীরের কিছু লক্ষণ কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়। শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া, অজ্ঞান হয়ে পড়া, অতিরিক্ত বমি বা ডায়রিয়া এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি।

শেষ কথা: গরম এখন আর কেবল ঋতুর বৈশিষ্ট্য নয়–এটি একটি নীরব কিন্তু মারাত্মক জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি। তবে সচেতনতা, প্রস্তুতি এবং সময়মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে এই ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। এখন প্রশ্ন একটাই– আমরা কতটা প্রস্তুত?

الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১): ***সুন্নাত সালাত না পড়লে সমস্যা বা গুনাহ হবে কি?*** *মো. বেলায়েত. ধামরাই, ঢাকা।*

জবাব: না, কোনো গুনাহ হবে না, তবে অবজ্ঞা করলে গুনাহ হবে। একজন সচেতন মুসলিম সুন্নাত সালাত কখনই বর্জন করতে পারেন না। কেননা হাদীস এসেছে, কিয়ামতের দিন বান্দার কাজসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি (নিয়মিতভাবে) ঠিকমত সালাত আদায় করা হয়ে থাকে তবে সে নাজাত পাবে এবং সফলকাম হবে। যদি সালাত নষ্ট হয়ে থাকে তবে সে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হবে। যদি ফরয সালাতের মধ্যে কিছু কমতি হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা বলবেন: দেখো, বান্দার কোনো নফল সালাত আছে কিনা। থাকলে তা দিয়ে ফরযের এ ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর সকল কাজের বিচার পালাক্রমে সম্পন্ন করা হবে– *(তিরমিযী- ৪১৩; ইবনু মাজাহ- ১৪২৫, সহীহ)*। সুতরাং যে সুন্নাত সালাত ছেড়ে দিবে সে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

জিজ্ঞাসা (০২): ***ব্যবসা করার সময় মহিলা কাস্টমার আসে। এখন কিভাবে নজর হেফাজত করবে?*** *মো. ইমন হোসেন, টঙ্গী, গাজীপুর।*

জবাব: যতটুকু সম্ভব সরাসরি তাকানো থেকে বিরত থাকুন। নিচের দিকে বা অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বলুন। যদি তার দিকে দৃষ্টি পরে যায় দ্রুত সড়িয়ে নিন। কেননা হাদীস এসেছে,

জারীর ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে (কারো প্রতি) হঠাৎ দৃষ্টি পড়া বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন। *(আবূ দাঊদ- ২৮৬৪; মুসলিম- ২১৫৯)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন: হে 'আলী! কোনো নারীকে একবার দেখার পর দ্বিতীয়বার দেখবে না। কেননা তোমার জন্য প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে, কিন্তু দ্বিতীয়বার কোনোভাবেই অনুমোদিত নয়। *(আবূ দাঊদ- ২১৪৯, হাসান)*

যদিও কিছু আলেম, নারীর মুখ খোলা রাখার বিষয়ে উদারতা দেখিয়েছেন কিন্তু কোনোভাবেই তার দিকে তাকানোর অনুমতি দেননি। কেননা আল্লাহ পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখতে আদেশ করেছেন। *(সূরা আন্-নূর: ৩০)*

অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি চালনার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে নবী কারীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন: অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি ইবলীসের বিষাক্তবাণ বিশেষ। *(আশ-শিহাব- ১ম খণ্ড, ১৯৫-১৯৬ পৃ.)*

আল্লামাহ ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: দৃষ্টি হচ্ছে এমন একটি তীর, যা মানুষের হৃদয়ে বিষের উদ্রেক করে। *(ইবনু কাসীর- ৩য় খণ্ড, ৩৭৬ পৃ.)*

জিজ্ঞাসা (০৩): ***আমি একজন অবিবাহিত যুবক। কিছুদিন আগে আমার একটা হারাম সম্পর্ক ছিল। আমাদের মাঝে লিপকিস হয়, যার কারণে উত্তেজনাবশত আমার যৌনাঙ্গ দিয়ে সাদা পানি বেরিয়ে যায়। এতে করে ইসলামী শরিয়া মোতাবেক আমার ওপর যিনার যেই শাস্তি ১০০ বেতের আঘাত, তা কী আবশ্যিক?*** *কিউরিয়াস (ছদ্মনাম) তেজগাঁও, ঢাকা।*

জবাব: না, এতে আপনার ওপর যিনার শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে আপনাকে তাওবাহ্ করতে হবে ও হারাম সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হবে নতুবা তা আপনাকে ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যাবে। ব্যভিচার বড় পাপ ও শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

আপনার মতো একটি ঘটনা রাসূলের যুগে সংঘটিত হয়েছিল, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুম্বন করে বসে। পরে সে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁর গোচরীভূত করে। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন: "দিনের দু'প্রান্তে- সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম অংশে সালাত কায়েম করো। নিশ্চয়ই ভালো কাজ পাপাচারকে মিটিয়ে দেয়"- *(সূরা হূদ: ১১৪)*। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ কি শুধু আমার বেলায়? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: আমার সকল উম্মাতের জন্যই। *(বুখারী- ৫২৬)*

তবে রাসূল (ﷺ) অন্য হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বাণী আদমের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের যিনা হলো দেখা, জিহবার যিনা হলো কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করা এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে– *(বুখারী- ৬২৪৩)*। অর্থাৎ- অবৈধ সম্পর্ক ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যাবে তাই তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

জিজ্ঞাসা (০৪): ***মসজিদে যাওয়ার রাস্তায় পানি উঠলে জামা'আত মিস করা যাবে কিনা?*** *মো. ইমন হোসেন টঙ্গী, গাজীপুর।*

জবাব: হ্যাঁ, আপনার জন্য উক্ত কারণে জামা'আত মিস করা বৈধ আছে। উলামাগণ যে সমস্ত কারণে জামা'আত ছাড়ার বৈধতার কথা উল্লেখ করেছেন, তার একটা বৃষ্টি বা রাস্তার সমস্যা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।" *(সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮)*

তিনি আরো বলেছেন: "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৮৫)*

ইবনু কুদামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে (১/৩৬৬) বলেছেন: "এমন বৃষ্টির কারণে জুমু'আহ্ ও জামা'আতে উপস্থিত না হওয়ার ওজর গ্রহণযোগ্য, যা কাপড় ভিজিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে এমন কাদা-পানির কারণেও (ওজর হবে), যার দ্বারা মানুষ নিজের শরীর ও কাপড়ে কষ্ট অনুভব করে।"

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক বৃষ্টির দিনে তাঁর মুয়াজ্জিনকে বলেছিলেন: তুমি যখন বলবে– أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ তখন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বলো না; বরং বলো: "তোমরা নিজেদের ঘরেই সালাত আদায় করো।" বর্ণনাকারী বলেন: মনে হলো লোকেরা বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করল। তখন ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: 'তোমরা কি এতে আশ্চর্য হচ্ছো? আমার চেয়েও উত্তম ব্যক্তি এ কাজ করেছেন– অর্থাৎ- মুহাম্মদ (ﷺ)। নিশ্চয়ই জুমু'আহ্ গুরুত্বপূর্ণ ফরজ; কিন্তু আমি অপছন্দ করেছি যে, তোমাদের বের হতে হবে এবং তোমরা কাদা ও পিচ্ছিল পথে চলতে কষ্ট পাবে।'

জিজ্ঞাসা (০৫): ***একটি বিষয় নিয়ে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতেছি, আমি যুবক মানুষ আমার উত্তেজনা বসত বেশি বেশি মযী বের হয়ে লুঙ্গিতে লাগে তা পরিবর্তন ছাড়া ও বাইরে থাকলে জিন্সের প্যান্টে লাগে, অনেক জায়গায় লেগে যায়। আমি সালাতের সময় লজ্জাস্থান পরিষ্কার করে ওযূ করে সালাত আদায় করি লুঙ্গি বা প্যান্ট পরিবর্তন করি না, বাইরে বা অফিসে প্যান্ট পরিবর্তন করার চান্স নেই, বাসাতেও চেঞ্জ করি না। এখন এ অবস্থায় আমার কি সালাত কবুল হচ্ছে? আমি এখন কি করতে পারি?***

মো. নাঈম
অন্তাহার, কাহালু, বগুড়া।

জবাব: আপনার মত সমস্যা ছিল স্বয়ং 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র। রাসূল তাঁর বিষয়ে সমাধান দিয়েছেন,

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খুব বেশি মযী নির্গত হত। এজন্য আমি গোসল করতাম, এমনকি (অত্যধিক গোসলের কারণে) আমার পিঠ ফেটে যেত (ব্যথা অনুভূত হতো)। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বিষয়টি অবহিত করলাম কিংবা কেউ তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলো। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: এরূপ করো না। তোমার (লজ্জাস্থানে) মযী দেখতে পেলে তা ধুয়ে নিবে এবং সালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে। তবে বীর্য নির্গত হলে গোসল করবে। *(আবূ দাউদ- ২০৬, সহীহ)*

অনুরূপ সমস্যা আরো ছিল সাহাবী সাহ্ল ইবনু হুনায়িফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র। রাসূল (ﷺ) তাকে সমাধান দেন–

সাহ্ল ইবনু হুনায়িফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অত্যধিক বীর্যরস নির্গত হতো। ফলে অধিকাংশ সময় আমি গোসল করতাম। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: বীর্যরস নির্গত হলে ওযূ করাই যথেষ্ট। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! কাপড়ে বীর্যরস লেগে গেলে করণীয় কি? তিনি বললেন: এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কাপড়ের যে স্থানে মযী লেগেছে বলে মনে হবে, ঐ স্থান হালকাভাবে ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট হবে।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় মযী ধৌত করতে হবে ও যেখানে মযী লেগেছে সেখানে পানি ছিটিয়ে দিলেই হবে। গোসল বা কাপড় পরিবর্তন করা আবশ্যক নয়।

সুতরাং আপনার সালাত বিশুদ্ধ হচ্ছে তবে ওযূর পর লজ্জা স্থানে পানি ছিটিয়ে দিবেন।

জিজ্ঞাসা (০৬): ***ফরজে আইন কাকে বলে ও ফরজে কেফায়া কাকে বলে? এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য কি? আর দু'টা মানা কি ফরজ?*** *মহিদুর রহমান, টঙ্গী, গাজীপুর।*

জবাব: ফকীহগণ (ইসলামী আইনজ্ঞরা) ফরযকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, ফরযে আইন এবং ফরযে কিফায়াহ।

ফরযে আইন: ফরযে আইন হলো এমন ফরয, যা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মুসলিমের ওপর ব্যক্তিগতভাবে পালন করা আবশ্যক। কেউ অন্যের পক্ষ থেকে তা আদায় করতে পারে না।

উদাহরণ: পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমাযানের সাওম সিয়াম), যাকাত (যার ওপর ফরয), হজ্জ (যার সামর্থ্য আছে), পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি।

ফরযে কিফায়াহ: ফরযে কিফায়াহ হলো এমন ফরয, যা মুসলিম সমাজের কিছু লোক আদায় করলে বাকিদের থেকে দায়িত্ব উঠে যায়। কিন্তু কেউই আদায় না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

উদাহরণ: জানাযার সালাত, মৃত ব্যক্তির গোসল ও দাফন, বিচারকার্য পরিচালনা, প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা প্রদান, মুসলিম সমাজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন ইত্যাদি।

ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়াহর মধ্যে পার্থক্য–

ফরযে আইনঃ প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আবশ্যক, একজন আদায় করলে অন্যের দায়িত্ব আদায় হয় না, না করলে ব্যক্তি নিজে গুনাহগার হবে।

ফরযে কিফায়াহঃ সমষ্টিগতভাবে আবশ্যক, কিছু লোক আদায় করলে বাকিদের দায়িত্ব শেষ, কেউ না করলে সবাই গুনাহগার হবে।

উভয়টি মানা কি ফরয?

হ্যাঁ, ফরযে আইন এবং ফরযে কিফায়াহ উভয়ই মহান আল্লাহর ফরযকৃত বিধান। তাই উভয়টিকে মানা, বিশ্বাস করা এবং যথাযথভাবে পালন করা ফরয।

তবে পার্থক্য হলো– ফরযে আইন প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজে পালন করতে হবে। ফরযে কিফায়াহ এমনভাবে আদায় হতে হবে যেন মুসলিম সমাজে তা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

ইমাম ইবনু কুদামাহ বলেন, ফরযে কিফায়াহ এমন একটি দায়িত্ব, যা কিছু লোক আদায় করলে অন্যদের থেকে দায়মুক্তি ঘটে; কিন্তু কেউ আদায় না করলে সকলেই পাপের অংশীদার হয়। *(আল মুগনী- মাসয়ালা নং- ৪৫৬১)*

জিজ্ঞাসা (০৭): ***আমাদের মসজিদ-এর ইমাম ঝাড়ফুঁক করে, তিনি পানির মধ্যে তাকিয়ে রোগ সম্পর্কে বলে দেন, এছাড়াও চুরি যাওয়া বস্তু ও চোর খুঁজে বের করে দেবার দাবি করে। এই কর্মকাণ্ড কি শরিয়তসম্মত? তার পিছনে কি সালাত হবে?*** *মো. তোফায়েল, নলডাঙ্গা, নাটোর।*

জবাবঃ আপনি যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে ঝাড়ফুঁকের বিষয়টি যদি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে হয় তাহলে তা বৈধ। কেননা নবী (ﷺ) নিজেও রুকইয়াহ করেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন। *(বুখারী- ৫৭৩৯, ৫৭৪২; মুসলিম- ২২০০)*

এছাড়া উল্লিখিত কাজগুলো কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত শরয়ী ঝাড়ফুঁকের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিশেষ করে, পানির দিকে তাকিয়ে রোগ নির্ণয় করা, চোর শনাক্ত করার দাবি করা অথবা হারিয়ে যাওয়া জিনিসের অবস্থান বলে দেওয়ার দাবি করা, এসব এমন বিষয় যা সুস্পষ্ট শরয়ী প্রমাণ ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "বলুন, আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে তারা কেউই গায়েবের খবর জানে না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।" *(সূরা আন্-নামলঃ ৬৫)*

যদি কোনো ব্যক্তি এসব কাজে গণকবিদ্যা, জিনের সাহায্য, তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-তন্ত্র বা যাদুবিদ্যার ওপর নির্ভর করে, তাহলে তা মারাত্মক গুনাহ ও জঘন্য অপরাধ। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা শিরক পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। তদ্রূপ, রোগ নির্ণয় বা গোপন বিষয় জানার উদ্দেশ্যে রোগীর কাপড়, সুতা, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য বস্তু বা অন্য কোনো নিদর্শন চাওয়া, এগুলোও শরয়ী রুকইয়ার অংশ নয়; বরং এগুলো অনেক প্রতারক, ভণ্ড পীর ও জাদুকরদের পরিচিত কৌশল, যার কোনো ভিত্তি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে নেই। তাই একজন মুসলিমের জন্য এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে সতর্ক থাকা এবং মানুষকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা জরুরি।

তার পিছনে সালাত আদায়ের হুকুমঃ এই ইমাম যদি প্রকৃতপক্ষে গণকবিদ্যা, যাদু, জিনের সাহায্য গ্রহণ বা এমন কোনো 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসে লিপ্ত হন যা কুফরির পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাহলে তাকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া বা তার পিছনে সালাত আদায় করা বৈধ নয়।

তবে যদি তার কর্মকাণ্ড কুফরিতে না পৌঁছে; বরং বিদআত বা শরীয়তবিরোধী কিছু কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে তার পিছনে সালাত আদায় হয়ে যাবে।

তবে তাকে উপদেশ দেওয়া, তার সংশোধনের চেষ্টা করা এবং তার পরিবর্তে অধিক জ্ঞানী, সুন্নাহর অনুসারী ও তাকওয়াবান ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করার প্রচেষ্টা করা উচিত।

জিজ্ঞাসা (০৮): ***মূল মসজিদের জায়গার খতিয়ান আছে। শুনেছি ২টা দলিল হয়েছে, তার মধ্যে ১টা দলিল আছে, বাকীটা আছে কিনা জানা নেই, তবে খতিয়ান মসজিদের নামে হয়েছে। শৌচাগার, অজুখানা ও ঈদগাহের জায়গাটা মৌখিক সম্মতিতে মসজিদ ও সমাজ কমিটি নিয়েছে উক্ত জায়গায় স্থাপনা করে ১৫/১৬ বছর আগে দখলে নিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি রেজিষ্ট্রি করে নেয়নি। নিতে পারতেছে না। এ অবস্থায় উক্ত জায়গার মালিক কি মসজিদ? উল্লেখ্য যে, ঐ জায়গাটা মলিক পক্ষ অন্য লোকের কাছে বিক্রি করেছে। এ অবস্থায় মসজিদে সালাত পড়া সঠিক/সহীহ-শুদ্ধ হবে কিনা?। ইসলামের আলোকে সমাধান দিন।*** *মোহাম্মদ শাহজাহান, ফেনী।*

জবাবঃ মসজিদের মূল জায়গা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কেননা তা সরকারি ভাবেই মসজিদের নামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে খতিয়ানের মাধ্যমে। তবে মসজিদের পাশে শৌচাগার, ওযূখানা ও ঈদগাহের জায়গাটা নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার শারঈ সমাধান হচ্ছে, উক্ত জায়গার মালিক হবে মসজিদ তথা তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। কেননা উক্ত জায়গা মৌখিকভাবে দান করার কারণে সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে যদিও সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি না করা হয়ে থাকে তবুও তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবেই গণ্য হবে। কথার মাধ্যমে দান বা ওয়াকফ সাব্যস্ত হবে এতে সকলের ঐক্যমত রয়েছে। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) শিরোনাম নিয়ে এসেছেন, "যদি কেউ বলে যে, আমার

বাড়ীটি মহান আল্লাহর ওয়াস্তে সাদাক্বাহ্ এবং ফকীর বা অন্য কারো কথা উল্লেখ না করে তবে তা জায়িয।" *(বুখারী- ৫৫/১৪, ২৭৫৬ নং হাদীসের পূর্বে)*

তিনি আরো বলেন, কেউ যদি বলে 'আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর ওয়াস্তে সাদাক্বাহ্ তবে তা জায়িয। *(বুখারী- ৫৫/১৫, ২৭৫৬ নং হাদীসের পূর্বে)*

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ওয়াক্ফ (মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে সম্পত্তি উৎসর্গ) কথা দ্বারা যেমন সহীহ হয়, তেমনি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ওয়াক্ফের অর্থ প্রকাশকারী কাজের মাধ্যমেও সহীহ হয়। যেমন- কেউ তার জমিকে মসজিদ বানিয়ে দেয়, অথবা লোকদের সেখানে সালাত পড়ার অনুমতি দেয়, কিংবা সেখানে আযান ও ইকামতের ব্যবস্থা করে। *(আল ইখতিয়ারিয়াত- ১৭০ পৃ.)*

সুতরাং কথার মাধ্যমেই দান সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তাই উক্ত জমি বিক্রি করা সম্পূর্ণ হারাম ইসলামী শরীয়তে।

কিন্তু দেশীয় আইন অনুযায়ী দলিল না থাকায় কমিটিরা দাতার সাথে কথা বলে দেখতে পারেন যদি তারা সমাধান না করেন তাহলে পরকালে পাপী হবেন। তবে উক্ত মসজিদে সালাত আদায়ে কোনো সমস্যা নেই ইন্ শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (০৯): ***একজন বক্তা বলেছেন, 'উসমান ইবনু সালেহ নামক একজন রাসূল (ﷺ)-এর জিন্ সাহাবী ছিল তা কতটুকু সঠিক?***

শাহিদুল ইসলাম
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

জবাব: আলেমদের বিশুদ্ধ মতে, জিন্দের মধ্য থেকেও সাহাবী আছে। ইবনু হাজার বলেন,

জিন্দের ব্যাপারে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো– তারাও সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, নবী (ﷺ) নিশ্চিতভাবেই জিন্দের কাছেও প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা শরীয়তের বিধান পালনে দায়বদ্ধ (মুকাল্লাফ)। তাদের মধ্যে অবাধ্যও আছে এবং অনুগতও আছে। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি (জিন্) নবী (ﷺ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছে এবং ঈমান এনেছে, তার নাম সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করতে দ্বিধা করা উচিত নয়। *(ফাতহুল বারী- ৭ খণ্ড, ৪ পৃ.)*

ইবনু হাজার তাঁর আল ইসাবাহ গ্রন্থে নবী (ﷺ)-এর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ও তাঁর প্রতি ঈমান আনা বেশ কয়েকজন জিন্নের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাদের কারো কারো জীবনীও লিখেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে– আহক্বাব (أحقب), আরক্বাম (الأرقم), যুবা'আহ (زوبعة), হাসির (حاصر) প্রমুখ।

তবে উল্লিখিত 'উসমান ইবনু সালেহ নামে কোনো জিন্ সাহাবার কথা ইবনু হাজার বা ইবনুল আসির তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

তবে ইবনুল আসির 'আম্র আল জিন্নীর জীবনিতে উল্লেখ করেছেন যে, 'উসমান ইবনু সালেহ আল মিসরী তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। *(উসদুল গবাহ- জীবনি নং- ৩৮৯৩)*

জিজ্ঞাসা (১০): ***আমার ওয়াইফের মাথায় মেন্টালিটি সমস্যা আছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গুরুত্ব তার বুঝে আসে কম। আমি বাসায় যখন সালাত আদায় করি তখন সে হাসি, ঠাট্টা-তামাশা করে আমাকে হাসানোর চেষ্টা করে। শ্বশুরবাড়ির লোকজন মাথার সমস্যার কথা আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছে। আমার ওয়াইফকে মৌখিকভাবে সামনাসামনি দু'বার তালাক দিয়েছি। প্রথমবার তালাক দেওয়ার আড়াই মাস বা তিন মাস পর দ্বিতীয় তালাক দিয়েছি এবং তৃতীয় তালাকের সময় কোর্টের মাধ্যমে তার অনুপস্থিতিতে দেওয়া হয়েছে। তাকে জানানো হয়নি, কোর্টের মাধ্যমে তার বাড়িতে নোটিশ পাঠানো হয়েছে, তারপরে সে জানতে পারছে। এখন আমি কি করতে পারি?***

মনসুরুল ইসলাম সোহাগ, গাজীপুর।

জবাব: আপনি যদি প্রথম তালাকের পর ফিরিয়ে নিয়ে আবার ২য় তালাক দিয়ে থাকেন তাহলে ২টি তালাক এবং আবার ফিরিয়ে নিয়ে কোর্টের মাধ্যমে তালাক দিয়ে থাকেন তাহলে মোট ৩টি তালাক কার্যকর হয়েছে। উক্ত পদ্ধতিতে ৩টা তালাক কার্যকর হলে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না যতক্ষণ না সে অন্যত্র বিয়ে বসে ও তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক হবে এবং সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবেই তালাক হবে। চুক্তির মাধ্যমে বিয়ে তালাক হলে তা কার্যকর হবে না। তবে ২য় তালাকের পর কোর্টের মাধ্যমে কবে তালাক দিয়েছেন তা উল্লেখ করেননি।

বিশুদ্ধ মতে, এক তালাকের পর ইদ্দত পালন করতে হয়। ইদ্দতের সময়সীমা হায়েজা মহিলার ক্ষেত্রে ৩ হায়েজ বা মাসিক। আর উক্ত ইদ্দতের মাঝে যত তালাক দেওয়া হবে তা এক তালাক কার্যকর হবে তবে যদি ফিরিয়ে নিয়ে আবার তালাক দেয় তাহলে তা কার্যকর হবে ইন্ শা-আল্লাহ। *(ইসলাম শাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১২৬৫৪৯)*

তাই আপনার তালাকের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে না জানলে সমাধান দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আপনার শুদ্ধ সমাধানের জন্য একজন আলেমের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত নিন।

উল্লেখ্য যে, তালাকের সংবাদ বা তালাক দেওয়ার সময় স্ত্রী উপস্থিত থাকা বা তাকে জানিয়ে তালাক দেওয়া আবশ্যক না। সে না জানলেও তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে, স্ত্রীর দোষ গোপন করে আপনার শ্বশুর-শাশুড়ির পরিবার অন্যায় করেছেন।

জিজ্ঞাসা (১১): ***নাপাকি দূর করার সঠিক পদ্ধতি কি? দৃশ্যমান নাপাকি সরিয়ে ফেলে তার ওপর পানি ঢেলে***

দিলেই কি তা পাক হয়ে যাবে? নাকি সেই পানিও সরিয়ে ফেলতে হবে? আমার পড়ার টেবিলে প্রায়ই ইঁদুরের বিষ্ঠা দেখা যায় এখন যদি আমি দৃশ্যমান নাপাকিটা সরিয়ে কিছুটা পানি স্প্রে করি তাহলে কি তা পাক হবে যদি সেই পানি স্প্রে করার পর কোনো চিহ্ন না থাকে? নাকি নির্দিষ্ট কোনো পরিমান আছে কতটুকু পানি দিতে হবে? *মাসুদ রানা*
মাওনা, গাজীপুর।

জবাব: নাপাকি দূর করার সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, যেকোনো উপায়ে নাপাকি ও তার চিহ্ন বা গন্ধ দূর হলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে ইন্ শা-আল্লাহ। শুধুমাত্র কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা ৭ বার ধৌত করতে হয়, তারমধ্যে ১ বার মাটি দিয়ে পরিস্কার করতে হয়। *(বুখারী- ১৭২)*

তাছাড়া কোনো নাপাকি দূর করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি ব্যবহার করা শর্ত নয়।

সুতরাং নাপাকি দূর করে পানি দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে তার গন্ধ দূর করতে পারলেই তা পবিত্র হবে ইন্ শা-আল্লাহ। তাই আপনার ইঁদুরের বিষ্ঠা দূর করে তা পানি দিয়ে ধুয়ে বা মুছে ফেলুন পবিত্র হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, শুধু পানি ঢেলে দিলেই যথেষ্ট হবে না; বরং সে পানি মুছে ফেলতে হবে বা শুকাতে হবে।

জিজ্ঞাসা (১২): ***আমি আইন বিষয়ে পড়তে আগ্রহী। একটা বিষয় শুনলাম যে, মহান আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে কোনো রায় দিলে তা কুফ্‌রী হয়। বাংলাদেশের কিছু কিছু আইন আছে যেগুলো মানুষের তৈরি। এই হিসেবে জজ হলে অনেক ক্ষেত্রে এসব আইনে রায় দিতে হবে। এসব আইনে রায় দিলে কি কুফ্‌রী হবে? বাংলাদেশে জজ হওয়া কি তাহলে নাজায়িয? আর বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আইন ব্যবসা (অ্যাডভোকেট, ব্যারিস্টার হওয়া) করা কতটা হালাল হবে?*** *ইমরান হোসেন ইমন*
তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।

জবাব: নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করা এবং সেই শরীয়তের কাছেই ফয়সালার জন্য প্রত্যাবর্তন করা ফরয করেছেন। তিনি তাঁর শরীয়ত ব্যতীত অন্য কিছুর কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যাওয়া থেকে সতর্ক করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, এটি মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-মায়িদায় ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তার দ্বারা বিচার না করা কখনো কুফ্‌র, কখনো জুলুম এবং কখনো ফিসক (অবাধ্যতা) হতে পারে।

আর যারা প্রচলিত আইন (মানব রচিত আইন) অধ্যয়ন করে এবং যারা সেগুলো শিক্ষা দেয়, তারা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত:

প্রথম শ্রেণী: যে ব্যক্তি প্রচলিত আইন (মানব রচিত আইন) অধ্যয়ন করে বা অন্যদের শিক্ষা দেয় এর প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য, অথবা শরীয়তের বিধানসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করার জন্য, কিংবা এমন বিষয়ে তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য যা পবিত্র শরীয়তের বিরোধী নয়, অথবা অন্যদের এ ব্যাপারে উপকার করার জন্য তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ; বরং যদি তার উদ্দেশ্য হয় এসব আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্পষ্ট করা এবং শরীয়তের বিধানসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা, তাহলে সে সওয়াবেরও অধিকারী হতে পারে এবং প্রশংসার যোগ্য হতে পারে।

শর্ত হলো– সে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর শরীয়তের বিরোধী মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার করা হারাম।

দ্বিতীয় শ্রেণী: যে ব্যক্তি প্রচলিত আইন (মানব রচিত আইন) অধ্যয়ন করে বা অন্যদের তা শিক্ষা দেয় যাতে সে নিজে সে অনুযায়ী বিচার করতে পারে, অথবা অন্য কাউকে তা অনুযায়ী বিচার করতে সহায়তা করতে পারে; তবে সে একই সঙ্গে এ বিশ্বাসও রাখে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার পরিবর্তে অন্য কিছু দ্বারা বিচার করা হারাম, কিন্তু প্রবৃত্তির অনুসরণ, পদ-মর্যাদার লোভ বা অর্থ-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে; তাহলে এ শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা ফাসিক (অবাধ্য)।

তাদের মধ্যে কুফ্‌র, জুলুম ও ফিসক বিদ্যমান; কিন্তু তা ছোট কুফর (কুফর আসগর), ছোট জুলুম এবং ছোট ফিসক। যার কারণে তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় না। এ মতটিই আহলুল ইলমের নিকট সুপরিচিত। এটি ইবনু 'আব্বাস, তাউস, 'আত্বা ইবনু আবি রবাহ এবং সালাফ ও খালাফের বহু আলেমের মত।

তৃতীয় শ্রেণী: যে ব্যক্তি প্রচলিত (মানব রচিত) আইন অধ্যয়ন করে বা তা শিক্ষা দেয় এই বিশ্বাসে যে, এসব আইন দ্বারা বিচার করা বৈধ (হালাল) চাই সে শরীয়তকে উত্তম মনে করুক বা না করুক তাহলে এ শ্রেণীর ব্যক্তি মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে বড় কুফরে কাফির।

মুসলিম উম্মাহর আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন এমন কোনো সুস্পষ্ট ও দ্বীনের অপরিহার্যভাবে জানা বিষয়কে হালাল মনে করে, অথবা আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন এমন কোনো বিষয়কে হারাম মনে করে, সে কাফির হয়ে যায়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, আপনি যদি আইন নিয়ে লেখা পড়া করেন তার সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য এবং যে সমস্ত আইন শরিয়ত বিরোধী না তা দিয়ে বিচার করার জন্য তাহলে সমস্যা নেই ইন্ শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (১৩): ***ঘড়ি কোন হাতে পড়বো? ডান হাতে পরা কি জরুরি?*** *মাহতাব হাসান রিফাত*
লেক সার্কাস রোড, কলাবাগান, ঢাকা।

জবাব: ডান হাতে বা বাম হাতে যেটা সুবিধা সেটা করতে পারবেন ইন্ শা-আল্লাহ। আর এর কোনো একটিকে সুন্নাহবিরোধী বলা যাবে না।

বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "ডান হাতে বা বাম হাতে ঘড়ি পরিধান করতে কোনো অসুবিধা নেই; যেমন- আংটি পরিধান করার ক্ষেত্রেও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, নবী (ﷺ) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি ডান হাতেও আংটি পরেছেন এবং বাম হাতেও আংটি পরেছেন।" *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ- ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৫)*

একই মত ব্যক্ত করেছেন ইবনু 'উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ); বরং তিনি বাম হাতে ঘড়ি পরিধানকে বেশি সহজ ও সুবিধাজনক মনে করেন। ডান হাতে পরিধান সুন্নাহ, বাম হাতে পরিধান সুন্নাহ পরিপন্থী এমন কথা বলা সঠিক না। *(শারহুল মুমতি- ৬/১১০)*

জিজ্ঞাসা (১৪): ***আমি আজ ৩ থেকে ৪ মাস খুবই অস্থিরতার মধ্যে আছি। আমার মনে আল্লাহ এবং রাসূল (ﷺ)-কে নিয়ে বাজে চিন্তা আসে, যা আমি আনতে চাই না, তারপরও চলে আসে। এর জন্য আমি ভালোভাবে পড়ালেখা করতে পারছি না। আগেও আমার এমন সমস্যা হতো মাঝখানে ছিল না । ৩ থেকে ৪ মাস আবার শুরু হয়েছে। আমি সালাতে ও অন্যান্য আমলেও মনোযোগ দিতে পারছি না। এ থেকে আমি কীভাবে বাঁচবো যদি একটু বলতেন?*** আব্দুল্লাহ, *রাজশাহী।*

জবাব: যে ব্যক্তি এ ধরনের ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা ও অনাকাঙ্ক্ষিত চিন্তা)-তে আক্রান্ত হয়, তার কর্তব্য হলো এগুলোকে উপেক্ষা করা এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণে লিপ্ত না হওয়া। সে যদি এসব চিন্তাকে অপছন্দ করে, ঘৃণা করে এবং যথাসাধ্য এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তারপরও কোনো কোনো চিন্তা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে, তাহলে সে এ ব্যাপারে ক্ষমাপ্রাপ্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

"তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো (তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করো)।" *(সূরা আত্-তাগা-বুন: ১৬)*

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ)-এর কিছু সাহাবা তার সামনে এসে বললেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু খটকার সৃষ্টি হয় যা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করতেও মারাত্মক মনে করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সত্যই তোমাদের তা হয়? তারা জবাব দিলেন, জী, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: এটিই স্পষ্ট ঈমান (কারণ ঈমান আছে বলেই সে সম্পর্কে ওয়াসওয়াসা ও সংশয়কে মারাত্মক মনে করা হয়)। *(মুসলিম- ২৩৮)*

এ কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার উপায়: এগুলো মূলত শয়তানের পক্ষ থেকে আসে, তাই শয়তান থেকে পরিত্রাণের জন্য বেশি বেশি দু'আ করবেন।

১. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ. এটা বেশি বেশি পড়বেন। *(বুখারী- ৭২৯৬)*

২. বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করবেন, কেননা কুরআন অন্তরের রোগের চিকিৎসা। *(সূরা ইউনুস: ৫৭)*

৩. বেশি বেশি দু'আ পড়বেন।

৪. নিজেকে অপরাধী ভাবা বন্ধ করুন: আল্লাহ তা'আলা মনের অজান্তে আসা অনিচ্ছাকৃত চিন্তার জন্য কোনো গুনাহ দেন না, যতক্ষণ না আপনি সেটা মুখে উচ্চারণ করছেন বা সেই অনুযায়ী কাজ করছেন। *(সূরাবাক্বারাহ: ২৮৬; বুখারী- ২৫২৮)*

৫. চিন্তাকে পাত্তা না দেওয়া (উপেক্ষা করা): যখনই এমন কোনো বাজে চিন্তা মাথায় আসবে, ওটার সাথে যুক্ত হবেন না বা চিন্তাটাকে 'কেন আসলো' তা নিয়ে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে যাবেন না।

৬. উক্ত কুমন্ত্রণা যদি সালাতে আসে তাহলে তিন বার أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. পড়ে বাম দিকে থুথু ফেলবেন। *(মুসলিম- ২২০৩)*

আবার এরূপ সমস্যা অসুস্থতার কারণেও হতে পারে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) বা এক ধরণের মানসিক অস্থিরতা বলা হয়। তাই প্রয়োজনে একজন মানসিক ডাক্তারে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলা সকলকে এ সমস্যা থেকে মুক্ত করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (১৫): ***এক দোকানদারের দোকান থেকে আমি কিছু টাকার জিনিস কিনেছিলাম পড়ে টাকা দিব বলে বা বাকিতে, সেই টাকা দোকানদারকে পরিশোধ করার আগেই সে মারা গেলো এখন আমার করণীয় কি? আমি তার এই ঋণ কিভাবে শোধ করবো, বিচার দিবসে আমি তার থেকে মুক্ত কিভাবে হব?*** *মো. রেদোয়ান, কুশুরা, ধামরাই, ঢাকা।*

জবাব: আপনি উক্ত ব্যক্তির ওয়ারিশদের নিকট তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিন বা যদি সে দোকান এখনো তার পরিবার পরিচালনা করে তবে তাদেরকে আপনার বকেয়া মূল্য বুঝিয়ে দিন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানত তার হক্বদারদের কাছে পৌঁছে দাও।" *(সূরা আন্-নিসা: ৫৮)*

আর নবী (ﷺ) বলেছেন: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা জুলুম।" *(বুখারী- ২২৮৭)*

আপনি যদি তার ঋণ পরিশোধ না করেন তাহলে কিয়ামতের দিন উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

জিজ্ঞাসা (১৫): ***আমার হবু স্বামী যার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে সে একদিন আমাকে বলেছে আমি যখনই তোমাকে বিয়ে করি কোনোদিন তোমার সাথে সংসার করবো না। তার নিয়ত তালাকের ছিল না। কিন্তু আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করি, তোমার নিয়ত কি তালাকের ছিল? সে বলল, হ্যাঁ। তারপর আমি কিছুক্ষণ পর আবারও জিজ্ঞেস করলাম তোমার নিয়ত কি তালাকের ছিল? সে বলল, না। তাহলে কি তালাক হয়ে যাবে?*** *ইয়াসমিন মণ্ডল*
ভারত।

জবাব: তালাক হবে না। চাই তার তালাকের নিয়ত থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আবূ দাঊদ সুনান আবী দাউদে শিরোনাম নিয়ে এসেছেন, "বিয়ের আগে তালাক প্রদান"-এর অধীনে হাদীস নিয়ে এনেছেন: নবী (ﷺ) বলেছেন, যে মহিলার ওপর অধিকার নেই তাকে তালাক দেয়া যায় না, যে গোলামের মালিকানা নেই, তাকে আযাদ করা যায় না। তোমার মালিকানাধীন বস্তুই কেবল বিক্রয়যোগ্য। ইবনুস সাব্বাহ আরো বলেন, যে বস্তুর ওপর তোমার মালিকানা নেই তার মান্নাত পূরণ করতে হবে না। *(আবূ দাউদ- ২১৯০, হাসান)* সুতরাং বিয়ের আগে সরাসরি তালাক বা অস্পষ্ট শব্দে তালাক কোনোটাই কার্যকর হবে না।

জিজ্ঞাসা (১৬): ***আমরা যখনই কোনো সহীহ হাদীসভিত্তিক আমল করতে যাই তখনই এক শ্রেণির আলেম নিম্নে বর্ণিত আয়াত বলে সহীহ সুন্নাহ আমলগুলো করার এক প্রকার বাধা দেন। বলেন "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য"– (সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৯১)। এখন প্রশ্ন হলো– সহীহ সুন্নাহভিত্তিক আমল করা কি ফিতনা, আর যদি ফিতনাই হবে তাহলে রাসূল (ﷺ) কি এমন ফিতনা সৃজন করে গিয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)। এখন আমাদের করণীয় কি আমরা কি সহীহ সুন্নাহভিত্তিক আমল করবো নাকি বন্ধ করে দিবো?*** *কবিরুল ফরাজী*
গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।

জবাব: প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে বললে, সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাহর ওপর আমল করা কখনোই ফিতনা নয়; বরং রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহকে পরিত্যাগ করাই প্রকৃত ক্ষতির কারণ। আল্লাহ বলেন: "রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" *(সূরা আল-হাশর: ৭)* আরো বলেন: "অতএব যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন এ ব্যাপারে সতর্ক থাকে যে, তাদের ওপর কোনো ফিতনা অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত না হয়।" *(সূরা আন্-নূর: ৬৩)*
এখানে লক্ষ্য করুন, আল্লাহ রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণকে ফিতনা বলেননি; বরং তাঁর আদেশের বিরোধিতাকে ফিতনার কারণ বলেছেন।

"ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য" আয়াতের প্রকৃত অর্থ:
আল্লাহ বলেন, "ফিতনা হত্যার চেয়েও কঠিন।" *(সূরা বাক্বারাহ: ১৯১)*
তাফসীরবিদগণ ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে "ফিতনা" বলতে মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, শিরক, কুফর, নির্যাতন ও ধর্মীয় নিপীড়নকে বোঝানো হয়েছে; সহীহ সুন্নাহর ওপর আমল করাকে নয়। ইবনু 'আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখ মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শিরক ও দ্বীনের ব্যাপারে নিপীড়নের কথা উল্লেখ করেছেন। *(তাফসির ইবনু কাসির উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*

কখন সুন্নাহর কোনো আমল প্রকাশ্যে না করা যেতে পারে?
সালাফদের বক্তব্য অনুযায়ী, কোনো সুন্নাহর আমল যদি এমন পরিস্থিতিতে করা হয় যেখানে বড় ধরনের অশান্তি, মারামারি, বা আরো বড় ক্ষতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সাময়িকভাবে তা গোপনে বা উপযুক্ত সময়ে করা যেতে পারে। কিন্তু এটি সুন্নাহকে বাতিল করা নয়; বরং হিকমতের সাথে বাস্তবায়ন করা।

অতএব, যদি কোনো আমল সত্যিই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে তা পালন করা উচিত। তবে তা করতে হবে ইখলাস, হিকমত, নম্রতা এবং মুসলিমদের ঐক্যের প্রতি যত্ন রেখে। সুন্নাহ পালন করা ফিতনা নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা।

জিজ্ঞাসা (১৭): ***আমি আমার স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেইনি (তাফবীয তালাক)। কাবিননামায় তা দেওয়া আছে কিনা তা আমি জানি না, কারণ আমাকে জানানো হয়নি। তবে একদিন রাগ করে আমি তাকে বলেছিলাম: তুমি আমাকে তালাক দাও। তখন সে রাগ করে তিনবার বলেছে– "তোমাকে তালাক দিলাম, তারপর একসাথে দু'বার বলেছে তালাক, তালাক। সে রেগে বলে দিছে। আমি জানতাম না যে, স্ত্রীকে তালাক-এর অধিকার দেওয়া যায়। আমার তালাক এর কোনো ইচ্ছা ছিল না। আমরা দু'জনেই খুব হতাশায় ভুগছি এখন জানতে চাচ্ছি, এ অবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে কি আমাদের তালাক হয়েছে?***
রিপন শেখ, রাজবাড়ী।

জবাব: স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতাকে তালাকে তাফবীয বলে। আপনি জানেন আর না জানেন কাবিন নামায় স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বা পরবর্তীতে স্ত্রী তালাক দিতে বলার মাধ্যমে তাকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছেন।

এরপর স্ত্রী একসাথে একাধিক তালাক দিলেও তা এক তালাক কার্যকর হবে। কেননা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতার ক্ষেত্রে সাধারণত তালাকে রজঈ-এর মালিক হয়। সাথে সাথে একসাথে একাধিক তালাক

দিলেও তা এক তালাক কার্যকর হয়। *(ইসলাম শাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ২৮৫৮৮১)*

সুতরাং আপনার স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত তালাক কার্যকর হলেও সংসার করতে কোনো বাঁধা নেই ইন্ শা-আল্লাহ। কেননা তা এক তালাক কার্যকর হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে বলেছেন, তুমি আমাকে তালাক দাও। এর মাধ্যমে যদি তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেওয়ার নিয়ত করেন তাহলে তা তালাকে তাফবীয হবে নতুবা না। কেননা সাধারণত স্ত্রী তালাক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। তবে যেহেতু আপনি কাবিননামায় স্বাক্ষর করে তাকে তালাকে তাফবীযের ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন তাই আপনার স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত তালাক এক তালাক হিসেবে গণ্য হবে। অবস্থা যাইহোক, আপনারা সংসার করতে পারবেন, কোনো সমস্যা ছাড়াই।

জিজ্ঞাসা (১৮): ***আমি জানতে চাই বেতর সালাতের শেষ রাকায়াতে রুকূ' থেকে উঠে দু'আ কুনুত-এর সাথে ১০-১১টা কোরআন মাজিদ ও হাদীসের দু'আ পড়া যাবে কি?***

ফয়সাল মাহবুব, ঢাকা।

জবাব: যাবে ইন্ শা-আল্লাহ। তবে তা নিয়মিত করা উচিত নয় কেননা সাধারণ মানুষ সেগুলোকে বেতরের নির্ধারিত দু'আ মনে করে নিতে পারে।

এ বিষয়ে ইবনু 'উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, (নির্ধারিত দু'আ) এর চেয়ে বেশি দু'আ করাতেও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, যখন প্রমাণিত হলো যে এটি দু'আর একটি স্থান (অর্থাৎ- কুনূতের স্থান), আর এই দু'আকে এমন কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা হয়নি যার অতিরিক্ত কিছু বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন মূলনীতি হলো– মানুষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো দু'আ করতে পারে।

তবে নবী থেকে যে দু'আটি বর্ণিত হয়েছে, সেটির প্রতি যত্নশীল থাকা এবং তা পরিত্যাগ না করাই উত্তম। তাই প্রথমে বর্ণিত (মাসনূন) দু'আটিই পড়া উচিত। এরপর ইচ্ছা করলে অতিরিক্ত দু'আ করা যেতে পারে, এতে কোনো বাধা নেই।

এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁদের কুনূতের দু'আয় কাফিরদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করতেন। অথচ এ বিষয়টি নবী (ﷺ) কর্তৃক হাসান ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে শেখানো কুনূতের দু'আয় উল্লেখ ছিল না। সুতরাং এতে আর কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

এরপরেও হাদীসের ভাষা হলো– "আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন, যা আমি বিতরের কুনূতে পাঠ করব।"

এ বাক্য থেকে এ কথাও বুঝা যেতে পারে যে, কুনূতে এ দু'আ ছাড়াও অন্য দু'আ করা যেতে পারে। কারণ তিনি বলেছেন, "একটি দু'আ শিক্ষা দিন", যা ইঙ্গিত করে যে, কেবল এটিই একমাত্র দু'আ নয়।

মোটকথা, এই দু'আর সাথে অতিরিক্ত দু'আ যুক্ত করাতে কোনো সমস্যা নেই। মানুষ মুসলমানদের দ্বীনি ও দুনিয়াবি প্রয়োজন, কল্যাণ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিয়ে উপযুক্ত দু'আ করতে পারে। *(ফাতাওয়া নূর আলাদ দারব লিল উসাইমিন- ৯/২৫৪৫)* তবে কুনুত অতিরিক্ত লম্বা করা নিন্দনীয়। *(আল মাজমূ'- ৩/৪৭৯)*

জিজ্ঞাসা (১৯): ***ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) এতবড় একজন ইমাম তাহলে ওনার অধিকাংশ ফাতাওয়া বা মাসায়েল য'ঈফ হাদীসের ভিত্তিতে কেন? দয়া করে জানাবেন।***

মো. সাহিদ আহমাদ মানসিফ
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

জবাব: এভাবে বলা ঠিক না যে, তার অধিকাংশ মাসয়ালা দূর্বল হাদীসের ভিত্তিতে। হ্যাঁ কিছু মাসয়ালা দূর্বল হাদীসভিত্তিক কারণ উনার সময় হাদীস সংকলন হয়নি; বরং যে হাদীস পৌঁছেছে সে অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সাথে সাথে তিনি মুরসাল হাদীসকে হুজ্জাত মনে করতেন। এছাড়াও আরো অনেক মূলনীতির কারণে এমন মনে হয়। কিন্তু আহলে সুন্নাত ও জামা'আত ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তিনি একজন মুজতাহিদ ছিলেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন: রাফউল মালাম আনিল আইম্মাতিল আলাম, লেখক- ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ।

জিজ্ঞাসা (২০): ***কেউ ইচ্ছেকৃত বা অনিচ্ছেকৃতভাবে ফরজ সালাত কাজা করলে তার হুকুম কী?***

আব্দুল কাইয়ুম
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

জবাব: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সালাতের জন্য সময় নির্ধারণ করেছেন এবং সময়মত সালাত আদায় করা ফরজ করেছেন। *(সূরা আন্-নিসা: ১০৩)*

কারণবশত সালাত কাজা হতে পারে যেমন ঘুমিয়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়া বা সফর। এছাড়া অন্য কারণে সালাত কাজা করা হারাম।

"ফকীহগণ একমত হয়েছেন যে, শরিয়তসম্মত কোনো ওজর (অজুহাত) ছাড়া সালাতকে এত দেরি করা যে তার সময় বের হয়ে যায় এটি হারাম।" *(আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ- ১০/৮)*

শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতকে তার সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পর্যন্ত বিলম্ব করে, অথবা এমনভাবে অ্যালার্ম বা ঘড়ি সেট

করে যে, সালাতের সময়ে তার ঘুম না ভাঙে; বরং সময় শেষ হওয়ার পরে জাগে, তাহলে সে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগকারী বলে গণ্য হবে। সে সকল আলেমের নিকটই এক মহা জঘন্য ও গুরুতর অপরাধ করেছে। তবে প্রশ্ন হলো– এর কারণে সে কি কাফির হয়ে যাবে, নাকি কাফির হবে না?"

সুতরাং কেউ ইচ্ছাকৃত সালাত কাজা করলে কিছু আলেমের মতে সে কাফির হয়ে যাবে। তাহলে এটা কত বড় পাপ চিন্তা করুন। যদিও বিশুদ্ধ মতে সে কাফের হবে না তবে বড় পাপী হবে ও কাজা আদায় করবে এবং তাওবাহ্ করবে।

জিজ্ঞাসা (২১): ***আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে শহরে থাকতাম। একটা বিষয় নিয়ে আমাদের মাঝে মনমালিন্য হওয়ায় আমরা গ্রামের বাড়ি চলে আসি। গ্রামে আসার পর তার মেজাজ আরো খিটখিটে হয়ে যায়, আমার সাথে সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। একদিন আমি তাকে বকাঝকা করি। এসব কারণে ঐ রাতে সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। এই নিয়ে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। আমার বাবা মা উভয়ই আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে। এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত?***

মোর্তজা আলম
কেশবপুর, যশোর।

জবাব: ইসলামে বাবা-মায়ের সম্মান ও আনুগত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধু বাবা-মা তালাক দিতে বলেছেন বলেই তালাক দেওয়া ফরজ হয়ে যায় না। যদি স্ত্রী দ্বীনদার হন, চরিত্রবান হন এবং সমস্যাগুলো সমাধানের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে শুধুমাত্র পারিবারিক চাপের কারণে তালাক দেওয়া আবশ্যক নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা করো, তবে একজন সালিস স্বামীর পরিবার থেকে এবং একজন সালিস স্ত্রীর পরিবার থেকে নিযুক্ত করো। তারা মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দেবেন।" *(সূরা আন্-নিসা: ৩৫)*

করণীয়: রাগের মাথায় তালাকের সিদ্ধান্ত নেবেন না। রাসূল (ﷺ)-এর উপদেশ স্মরণ করুন। তিনি বলেন, তোমরা নারীদেরকে উত্তম নাসীহাত প্রদান করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশি বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদেরকে নাসীহাত করতে থাকো। *(বুখারী- ৩৩৩১)*

কিছুদিন পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার সুযোগ দিন। উভয় পরিবারের বিচক্ষণ ও দ্বীনদার দুজন মানুষকে নিয়ে বসুন এবং সমাধানের চেষ্টা করুন। স্ত্রীর সঙ্গে শান্তভাবে কথা বলুন ও তাকে বুঝানোর চেষ্টা করুন এবং জানান যে, আত্মহত্যা করা বড় পাপ। শত চেষ্টা করার পরও সমাধান না হলে পিতা-মাতার কথা মতে তালাক দিবেন কেননা তালাককে শরীয়তসম্মত করা হয়েছে সমস্যা দূরীভূত করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা আন্-নিসা: ১৩০)*

জিজ্ঞাসা (২২): ***আমি বিশুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে পারি না, এজন্য আমার করণীয় কি? দয়া করে জানাবেন।***

মো. দীন ইসলাম কবীর
কিরাটন পূর্ব মাইজপাড়া, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

জবাব: বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা করা ফরজ। কেননা সালাতে কুরআন তেলাওয়াত করতে হয়। যদি কুরআন তেলাওয়াত বিশুদ্ধ না হয় তাহলে সালাত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ করেছেন,

"আর কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে।" *(সূরা আল-মুযযাম্মিল: ৪)*

তাই কুরআন বিশুদ্ধ করার জন্য আপনাকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, এরপরেও না পারলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

"আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৮৬)*

আপনার করণীয় হচ্ছে– একজন দক্ষ ক্বারীর কাছে কুরআন শিখুন। মসজিদের ইমাম, হাফেজ বা তাজবীদ জানা কোনো শিক্ষকের কাছে নিয়মিত পড়ুন। নিজে নিজে পড়ার পাশাপাশি অবশ্যই কাউকে শুনিয়ে সংশোধন করান। তাজবীদের মৌলিক নিয়ম শিখুন। যেমন- মাখরাজ, হরকত, মাদ, গুন্নাহ, ইখফা, ইদগাম ইত্যাদি ধীরে ধীরে শিখুন। প্রতিদিন অল্প সময় নির্ধারণ করুন। একজন শুদ্ধ ক্বারীর তিলাওয়াত শুনুন। সালাত বন্ধ করবেন না যতটুকু শুদ্ধভাবে পারেন ততটুকু পড়ে সালাত আদায় করতে থাকুন এবং শেখার চেষ্টা চালিয়ে যান।

একটি সুসংবাদ: রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে দক্ষ, সে সম্মানিত ও অনুগত ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং পড়তে গিয়ে কষ্ট অনুভব করে ও আটকে যায়, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।" *(বুখারী- ৪৯৩৭)*

কুরআন শিক্ষা নিজেই একটা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তাই উক্ত ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন।

জিজ্ঞাসা (২৩): ***তালাকের নিয়ত করে শুধু সংখ্যা বললে কি তালাক হবে? এক্ষেত্রে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে নিয়ত করে***

সংখ্যা বললে আর নিয়ত না করে বললে শরিয়তের হুকুম কি? *মোহাম্মাদ*

জবাব: স্পষ্ট তালাক শব্দ বা বিচ্ছেদের অর্থ বহন করে এমন শব্দ তালাকের নিয়তে বললে তালাক কার্যকর হবে। সুতরাং শুধুমাত্র নিয়তসহ বা নিয়ত ছাড়া সংখ্যা উচ্চারণ করলে তালাক হবে না। কেননা সংখ্যা তালাকের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো শব্দ নয়। তাই স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে নিয়তসহ বা নিয়ত ছাড়া যেভাবেই সংখ্যা উচ্চারণ করা হোক না কেন তালাক কার্যকর হবে না।

তালাক কার্যকরের জন্য শর্ত হচ্ছে– স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করতে হবে নতুবা তালাকের অস্পষ্ট শব্দ নিয়তসহ উচ্চারণ করতে হবে নতুবা তালাকের নিয়তে তালাক নামা লিখে পাঠাবে। শুধু নিয়ত করলেই তালাক হয় না। *(বুখারী- ২৫২৮)*

জিজ্ঞাসা (২৪): ***আমি কাজী মো. ইমরান অনলাইনে মোবাইলে একটি এ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ করে অর্থ উপার্জন করি। কাজটি হলো ওয়াক হাব নামক একটি এ্যাপস মোবাইলে চালু করে মোবাইল হাতে নিয়ে সকাল বেলা অথবা দিনের যে কোনো সময় শারিরীক ব্যায়াম যথা হাটা-চলা বা দৌড়ালে মোবাইলে এ্যাপস এর মধ্যে কিছু হ্যাস রেট উৎপাদন হয়। যার ভিতরে কোনো প্রকার অশ্লীল ছবি বা পর্ণগ্র্যাফি বা বিজ্ঞাপন জাতীয় এমন কোনো ছবি বা ভিডিও থাকে না, সেখানে শুধু কিছু সংখ্যা উঠে যেগুলোকে গুগল কোম্পানী হ্যাস রেট বলে। এই হ্যাস রেটের কাজ হলো যেমন- আমরা গুগলে, ইউটিউব, ফেইজবুক, ওয়াটসঅ্যাপ এইগুলোতে কোনো কিছু লিখে সার্চ দিলে বা কিছু জিজ্ঞাসা করলে সাথে সাথে আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেয় এই গুগল, ইউটিউব, ফেইজবুক, ওয়াটসঅ্যাপ-এর পিছনে একটি শক্তি কাজ করে। এই শক্তির নামই হলো হ্যাস রেট। এই শক্তি উৎপাদনের জন্য আমরা এই এ্যাপস-এ কাজ করে বিনিময়ে নাটস সংগ্রহ করে থাকি। পরবর্তিতে এই নাটস একচেঞ্জ বা বদল করে টাকা পাই। এই নাটস ওয়াকহাব কোম্পানী গুগল, ইউটিউব, ফেইজবুক, ওয়াটসঅ্যাপ কোম্পানীর কাছে বিক্রি করে তাদের নির্ধারিত কমিশন কর্তন করে বাকি টাকা আমাদেরকে প্রদান করে থাকে। এই কোম্পানিতে ফ্রিতে কিছু কাজ করা যায়, যার ইনকাম অতি স্বল্প, পার্মানেন্টভাবে কাজ করতে হলে কিছু টাকা জামানতস্বরূপ এডভান্স দিতে হয়, যার বিনিময়ে কোম্পানী আমাকে নাটস প্রদান করে থাকে। আমি কোম্পানীতে কাজ করতে না চাইলে ঐ নাটস বিক্রি করে আমার জামানতের টাকা আমি যে কোনো সময় ফেরত আনতে পারব। এতে কোম্পানীর কোনো বাধা নেই। এখন হুজুরের কাছে আমার জানার বিষয় হলো আমার এই কাজ এবং আমার জামানত শরীয়াতের পরিভাষায় বৈধতা আছে কিনা? জানালে উপকৃত হবো।*** *মো. নাইমুল ইসলাম*

কামরুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, কমলেশ্বরদী, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

জবাব: আপনার বর্ণনা অনুযায়ী এতে যথেষ্ট গারার বা ধোঁকা রয়েছে, তাই সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রথমতঃ আপনি লিখেছেন যে হাঁটাহাঁটি করলে অ্যাপে "হ্যাশ রেট" উৎপন্ন হয় এবং তা গুগল, ইউটিউবসহ অন্যরা কিনে নেয়। প্রযুক্তিগতভাবে এই দাবিটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। "হ্যাশ রেট" সাধারণত কম্পিউটিং শক্তি বা ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিংয়ের সাথে সম্পর্কিত একটি পরিভাষা। কেবল মোবাইল হাতে হাঁটার মাধ্যমে উৎপন্ন "হ্যাশ রেট" গুগল বা ফেসবুক কিনছে এ ধরনের দাবির পক্ষে শক্ত প্রমাণ থাকা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ কোনো আয় বৈধ হওয়ার জন্য সাধারণত জানা দরকার আপনি আসলে কী সেবা দিচ্ছেন ক্রেতা কে? কী পণ্য বিক্রি হচ্ছে? এর বাস্তব বাজারমূল্য আছে কি? কোম্পানির আয়ের উৎস কী? যদি কোম্পানির আয়ের প্রকৃত উৎস অস্পষ্ট হয় এবং শুধু নতুন সদস্যদের জমা টাকার ওপর পুরোনো সদস্যদের অর্থ প্রদান করা হয়, তাহলে তা প্রতারণা, জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে যা হারাম।

তৃতীয়তঃ আপনি বলেছেন "পার্মানেন্টভাবে কাজ করতে হলে কিছু টাকা জামানতস্বরূপ এডভান্স দিতে হয়।" এখানে কিসের জন্য জামানত জমা দিচ্ছেন? আয় কি মূলত হাঁটার কারণে, নাকি টাকা জমা রাখার কারণে বৃদ্ধি পায়? যদি বেশি টাকা জমা দিলে বেশি আয় হয় এবং আয়ের মূল ভিত্তি জমাকৃত অর্থ হয়, তাহলে বিষয়টি আরও সন্দেহজনক হয়ে যায়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

"হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝখানে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়সমূহ...।" *(বুখারী- ৫২)*

এছাড়াও হাদীসে এসেছে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাথরের টুকরা নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও ধোকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারণ করেছেন। *(মুসলিম- ৩৭০০)*

সুতরাং উক্ত পদ্ধতিতে উপার্জন বর্জন করায় উত্তম ও নিরাপদ।

জিজ্ঞাসা (২৫): ***জানাযার সালাতে ইমাম ভুল করে ৩য় তাকবীরের পরে সালাম ফিরিয়ে দিয়েছেন। এখন করণীয় কি? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানাবেন।*** *আব্দুল্লাহ*

হরিপুর, ঠাকুরগাঁও।

জবাব: সালাতুল জানাযায় ৪ তাকবীর হচ্ছে রকন তথা মূল। কোনো এক তাকবীর ছুটে গেলে সালাত পূর্ণ হবে না। তাই করণীয় হচ্ছে, ইমাম সাহেব কেবলামুখী হয়ে দু'আ পড়ে আরেকটি তাকবির দিয়ে সালাম ফিরাবেন। নতুন করে পুনরায় সালাত পড়া বা সাহু সাজদা দিতে হবে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) শিরোনাম নিয়ে এসেছেন,

হুমাইদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার আমাদের নিয়ে (জানাযার) সালাত আদায় করলেন, তিনবার তাকবীর বললেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জানানো হলে, তিনি কিবলামুখী হয়ে চতুর্থ তাকবীর দিলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন। *(বুখারী- অধ্যায়: ২৩/৬৪. জানাযার সালাতে তাকবীর চারটি)*

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নাজাশীর মৃত্যুর দিন তাঁর মৃত্যু খবর জানালেন এবং সাহাবীবর্গকে সঙ্গে নিয়ে জানাযার সালাতের স্থানে গেলেন এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করে চার তাকবীরে জানাযার সালাত আদায় করলেন। *(বুখারী- ১৩৩৩)*

শাইখ ইবনু উসাইমিন (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ইমাম যদি জানাযার সালাতে তিন তাকবীর বলে সালাম ফিরিয়ে দেন, তাহলে মুক্তাদির কী করা উচিত?

তিনি বললেন: "তার জন্য ওয়াজিব হলো ইমামকে সতর্ক করা (ভুল ধরিয়ে দেওয়া)।" প্রশ্নকারী বললেন: "যদি তিনি সতর্ক না হন?" শাইখ জবাব দিলেন: "যদি ইমাম সতর্ক না হন (অর্থাৎ- ভুল বুঝতে না পারেন), তাহলে মুক্তাদি নিজে চতুর্থ তাকবীর বলবে। এর মাধ্যমে ফরযে কিফায়াহ আদায় হয়ে যাবে।" *(আশ-শারহুল কাফী- ২/৩৫৬)*

বিশেষ নোট: ইমাম ভুল করে তৃতীয় তাকবীরের পরে যদি সালাম ফিরিয়ে দেন এবং কেউ সতর্ক করেননি বা পরবর্তীতে চতুর্থ তাকবীর দেওয়া হয়নি তাহলে উক্ত সালাত বাতিল হবে। সে মাইয়েতের যদি আর কোনো জানাযা আদায় না হয়ে থাকে এবং দাফন করা হয়ে যায় তাহলে কবরের ওপর সালাত আদায় করতে হবে।

জরুরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস পাবনা জেলা শাখার অধীনে নিম্নবর্ণিত পদে একজন অভিজ্ঞা মুবাল্লিগ ও একজন অভিজ্ঞ অফিস সহকারী নিয়োগ দেওয়া হবে। উল্লেখিত পদে আগ্রহী প্রার্থীগণের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র. নং	পদের নাম	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শর্তসমূহ	বেতন
১.	মুবাল্লিগ	০১	**দাওরায়ে হাদীস অথবা কামিল পাশ** (উচ্চতর ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে)	১. নূন্যতম ৫ বছর খুৎবা দেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২. কম্পিউটার ও আইসিটি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।	বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আলোচনা সাপেক্ষে
২.	অফিস সহকারী	০১	**দাওরায়ে হাদীস পাশ**	১. নূন্যতম ১ বছর উক্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২. কম্পিউটার ও আইসিটি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।	

আবেদনের নিয়মাবলী: ১. আগ্রহী প্রার্থীকে সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, পাবনা জেলা শাখা, পুরাতন বাঁশ বাজার, শিবরামপুর, পাবনা বরাবর স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। **২.** প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। **৩.** আবেদনপত্রের সাথে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি, চারিত্রিক ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র এবং জীবনবৃত্তান্ত সংযুক্ত করতে হবে।

বি. দ্র. আবেদনপত্র বাছাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে জমঈয়ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

আলহাজ্জ মো. ইমদাদ হোসেন
সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস,
পাবনা জেলা শাখা।

যোগাযোগের ঠিকানা: বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, পাবনা জেলা শাখা।
০১৭১১৫২৪১৯৫। ☎ ০২৫৮৮৮৪৫২৫০।

ই-মেইল: mdhpbd@gmail.com, **ফেইসবুক:** www.fb.com/mdhpbd।

تعريف الغلاف / প্রচ্ছদ পরিচিতি:

ইরাকে ইসলামের প্রথম যুগের মাটির মসজিদ আবিষ্কার: ইতিহাসের এক বিরল সাক্ষ্য

আবু ফাইয়ায জি. রহমান

ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলের ধি-কার প্রদেশের আল-রিফাঈ এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজে ইসলামের প্রথম যুগের একটি মাটির মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মসজিদটি হিজরি ৬০ সনের (৬৭৯ খ্রি.) দিকে নির্মিত হয়েছিল, অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের মাত্র প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে।

আবিষ্কারের পটভূমি: এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান পরিচালনা করে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একটি গবেষণা দল, যারা ইরাকের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় খননকাজ চালায়। আবিষ্কারটি ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয় এবং তা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করে।

ধি-কার অঞ্চল প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। এখানে অবস্থিত উর (Ur) নগরী ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মস্থান হিসেবে পরিচিত। ফলে ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের এমন একটি মসজিদের সন্ধান এই অঞ্চলের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক গুরুত্বকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

মসজিদের গঠন ও বৈশিষ্ট্য: প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী– মসজিদটির প্রস্থ ছিল প্রায় ৮ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৫ মিটার। এটি সম্পূর্ণ কাঁচা মাটি বা মাটির ইট দিয়ে নির্মিত ছিল। ভেতরে একটি ছোট মিহরাব বা ইমামের সালাত পরিচালনার স্থান পাওয়া গেছে। একসঙ্গে প্রায় ২০-২৫ জন মুসল্লি সেখানে সালাত আদায় করতে পারতেন। মসজিদটি একটি আবাসিক নগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল, যা সে সময়ে সংগঠিত মুসলিম বসতির উপস্থিতির প্রমাণ বহন করে।

কেন এই আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ?

প্রারম্ভিক ইসলামী যুগের স্থাপত্য নিদর্শন খুবই সীমিত। বিশেষ করে মাটি দিয়ে নির্মিত ভবনগুলো দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকে না। বৃষ্টি, বাতাস, বন্যা এবং প্রাকৃতিক ক্ষয়ের কারণে অধিকাংশ নির্মাণ বিলীন হয়ে গেছে। তাই ইসলামের প্রথম শতাব্দীর কোনো মসজিদের বাস্তব অবশেষ পাওয়া অত্যন্ত বিরল ঘটনা।

ধি-কার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক আলী শালগাম (Ali Shalgham) এই আবিষ্কারকে "প্রারম্ভিক ইসলামী যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, এই মসজিদ ইসলামের বিস্তার, নগরজীবন এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নতুন তথ্য উন্মোচন করবে।

'উমাইয়াহ্ যুগের একটি নিদর্শন: মসজিদটি ইসলামের প্রথম রাজবংশ 'উমাইয়াহ্ খিলাফতের সূচনাকালের সঙ্গে সম্পর্কিত। সে সময় ইসলামী রাষ্ট্র দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিল এবং নতুন নতুন জনপদে মসজিদ নির্মিত হচ্ছিল। আবিষ্কৃত এই মসজিদটি প্রমাণ করে যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে সুসংগঠিত মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ: গবেষকদের মতে, মসজিদটির অধিকাংশ অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে। কারণ এটি ভূমির উপরিভাগের খুব কাছাকাছি ছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পানি, বৃষ্টি ও বাতাসের প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে শুধু কিছু ভিত্তি, দেয়ালের অংশ এবং মিহরাবের চিহ্ন সংরক্ষিত রয়েছে।

ইসলামী ইতিহাস গবেষণায় তাৎপর্য: এই আবিষ্কার ইসলামী প্রত্নতত্ত্বের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি কেবল একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ নয়; বরং ইসলামের প্রথম যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের একটি প্রত্যক্ষ দলিল। এর মাধ্যমে জানা যায়–

মুসলিম সমাজ কীভাবে প্রাথমিক বসতি স্থাপন করত; মসজিদকে কেন্দ্র করে সামাজিক জীবন কীভাবে পরিচালিত হতো; ইসলামের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় অবকাঠামো কীভাবে গড়ে উঠেছিল।

উপসংহার: ইরাকের আল-রিফাঈ অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রায় ১,৩৫০ বছর পুরোনো এই মাটির মসজিদ ইসলামের প্রারম্ভিক ইতিহাসের এক অমূল্য নিদর্শন। ইসলামের প্রথম শতাব্দীর স্থাপত্যের বাস্তব সাক্ষ্য হিসেবে এটি শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্য নয়; বরং ইসলামী ইতিহাস গবেষকদের জন্যও এক বিরাট সম্পদ। ভবিষ্যৎ গবেষণা এ আবিষ্কার থেকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইবাদতকেন্দ্রিক জীবন সম্পর্কে আরো নতুন তথ্য উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. **25.00**

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান
তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত যাকাত ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১০২০২০০৬২০৮০৭
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, লোকাল অফিস, মতিঝিল শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৪ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪০০৯১১১০০০১২২১৪
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা।
bKash নগদ ০১৯৩৩৩৫৫৯০২ (মার্চেন্ট)

আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত